গল্প

স্বপ্ন

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

কলিকাতা
১৩৩৫

মূল্য পাঁচ সিকা

প্রকাশক—
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪, পার্শীবাগান, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার
- - - শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস - - -
৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৮৫০।২৮

ভূমিকা

স্বপ্নতত্ত্বের আলোচনায় প্রোফেসর ফ্রয়েডের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহাকে স্বপ্ন-রাজ্যের পথ-প্রদর্শক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মনোবিদ্যার দিক দিয়া পণ্ডিত-সমাজে আজ যে আলোচনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মূলে ফ্রয়েডের অপূর্ব্ব আবিষ্কার। প্রোফেসর ফ্রয়েড কে, এবং কি কৌশলেই বা তিনি স্বপ্ন-রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব-সমূহের সন্ধানলাভ করিলেন, সংক্ষেপে তাহাই বলিতেছি।

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) ভিয়েনা শহরের একজন চিকিৎসক। মানসিক নিদান ও চিকিৎসা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিয়া তিনি জগতে বরেণ্য হইয়াছেন। বিবর্ত্তনবাদ প্রচার করিয়া ডারউইন জীববিদ্যায় যুগান্তর আনিয়াছিলেন। অনেকের মতে ফ্রয়েডও তেমনি মনোবিদ্যায় এক নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। ক্রমবিবর্ত্তনবাদ প্রথমে বৈজ্ঞানিক সমাজে আদৃত হয় নাই। ইহার জন্য ডারউইনকে অনেকেরই উপহাসাস্পদ হইতে হইয়াছিল। মানুষ ও বানরের পূর্ব্বপুরুষ এক, এ কথা শুনিলে আত্মসম্মানে যেন

আঘাত লাগে। ফ্রয়েডও যখন প্রচার করিলেন, মাতৃভক্তি পিতৃভক্তি প্রভৃতি পবিত্রভাব, আর কামজ পাশবিক বৃত্তি মূলতঃ এক, তখন অনেকেই সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকেও লোকে উপহাস করিতে লাগিল। এখনও ফ্রয়েডের বিরুদ্ধবাদী অনেক আছেন সত্য, তথাপি ফ্রয়েডের মত ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্র গৃহীত হইতেছে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের কথা। ফ্রয়েডের বয়স তখন ২৪ বৎসর। তিনি সবেমাত্র ভিয়েনায় বায়ু অর্থাৎ স্নায়ু-রোগের বিশেষজ্ঞরূপে চিকিৎসা-ব্যবসায় সুরু করিয়াছেন। ভিয়েনা শহরে সুচিকিৎসক বলিয়া জোসেফ ব্রয়ারের (Joseph Breuer) তখন নামডাক খুব। ফ্রয়েড তাঁহারই সাহযোগীরূপে কাজ করেন। ব্রয়ারের হাতে সে-সময় হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্তা একটি মহিলার চিকিৎসার ভার ছিল। ইউরোপের বড় বড় চিকিৎসক রোগিনীকে সুস্থ করিতে পারেন নাই। মহিলাটি একদিন ব্রয়ারকে জানাইলেন যে, মনের সব কথা বলিলে বোধ হয় তাহার ব্যাধির প্রতিকার সম্ভব হইতে পারে। ব্রয়ারের সম্মতি পাইয়া রোগিনী তাহার ইতিহাস বলিতে সুরু করিল। তাহার বিবরণে অনেক অবান্তর কথা থাকিলেও চিকিৎসক সব কথাই মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন। ব্রয়ারের হাতে অনেক

রোগী, কাজেই একজনের নিমিত্ত অধিক সময় দেওয়া চলিল না। রোগিনীর কথা আর ফুরাইতে চায় না দেখিয়া, তিনি প্রত্যহ কিছু কিছু শুনিতে লাগিলেন। রোগিনী অকপটে তাঁহাকে সব কথাই বলিতে লাগিল। চিকিৎসকের সহানুভূতি পাইয়া তাঁহার উপর রোগিনীর শ্রদ্ধাভক্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যে-সব কথা চিকিৎসকের শুনিবার প্রয়োজন হয় না, অথবা যাহা বলা অসঙ্গত, ঘরের এমন অনেক কথাও ব্রয়ারকে শুনিতে হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, রোগিনী যতই মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল, তাহার ব্যাধির ততই উপশম হইতে লাগিল। মহিলাটি দিন-কয়েকের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। এই অদ্ভুত আরোগ্য-লাভের কথা ব্রয়ারের নিকট ফ্রয়েড শুনিতে পাইলেন। উভয়ে পরামর্শ করিলেন, ভবিষ্যতে এই প্রণালীতেই ঐ ধরণের রোগের চিকিৎসা করিবেন।

ক্রমে দেখা গেল, রোগীর বাল্যজীবনে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে, যাহা মনে করিতে লজ্জা ও ঘৃণার সঞ্চার হয়। এই-সকল ঘটনা রোগীর মন হইতে দৃশ্যতঃ মুছিয়া যায় বটে, কিন্তু চিকিৎসকের কাছে জীবন-কাহিনী বলিতে বলিতে তাহা ক্রমে ক্রমে রোগীর মনে পড়ে, এবং চিকিৎসকের সহানুভূতি ও

উৎসাহ পাইলে রোগী লজ্জা ও কষ্ট বোধ করা সত্ত্বেও চিকিৎসককে তাহা জানাইতে পারে। খুব খানিকটা কাঁদাকাটির পর মনের রুদ্ধ শোক যেমন প্রশমিত হয়, তেমনি চিকিৎসকের কাছে মনের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিবার পর রোগীর মনেও শান্তি আসে, আর তাহার রোগও অল্পে অল্পে সারিয়া যায়। ব্রয়ার ও ফ্রয়েড দেখিলেন, পুরাতন ঘটনা রোগীর স্মৃতিপথে জাগরূক হইলেই রোগের শান্তি হয় না। ঘটনাগুলির স্মৃতির সহিত মনে লজ্জা ঘৃণা, দুঃখ কষ্টেরও উদ্রেক হওয়া দরকার, নচেৎ কোনই ফললাভ হয় না। তাঁহারা এই চিকিৎসার নামকরণ করিলেন Cathartic Treatment (রেচন-চিকিৎসা)। তাঁহারা দেখিলেন, কতকগুলি দুঃখদায়ক ভাব মনে রুদ্ধ থাকিয়া রোগের সৃষ্টি করে এবং সেগুলি কোন উপায়ে মন হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিলেই রোগের শান্তি হয়। ভুক্ত দুষ্পাচ খাদ্যদ্রব্য উদরে জমিয়া থাকিলে যেমন পেটের অসুখ হয়, এবং জোলাপ দিয়া বাহির করিয়া দিলে যেমন সে অসুখ সারিয়া যায়, তেমনি মনের রুদ্ধ আবেগগুলি চিকিৎসার দ্বারা বাহির করিতে পারিলেই রোগী সুস্থ হয়। এইজন্য তাঁহারা এই চিকিৎসার নাম দিলেন—মানসিক রেচন-চিকিৎসা।

এই উপায়ে কিছুদিন চিকিৎসা করিবার পর ফ্রয়েড দেখিলেন, মনের অনেক গুপ্তকথা রোগী নিজেই জানে না ; সুতরাং সেগুলি জানিতে অনেক সময় লাগে। তিনি তখন সাব্যস্ত করিলেন রোগীকে সংবেশিত (hypnotize) করিলে তাহার মনের রুদ্ধ ভাবগুলি ধরা সহজ হইবে। এইভাবে চিকিৎসার পর ফ্রয়েড আর এক অসুবিধায় পড়িলেন ; এমন অনেক রোগী আসিতে লাগিল যাহাদের সংবেশিত করা অসম্ভব, অথবা সংবেশিত অবস্থাতেও যাহারা সকল কথা মনে আনিতে পারে না। ফ্রয়েড hypnotism (সংবেশন-প্রক্রিয়া) শিক্ষা করিয়াছিলেন—বিখ্যাত ফরাসী চিকিৎসক ব্যেরন্‌হাইমের (Bernheim) নিকট। সংবেশিত অবস্থায় রোগী যাহা-কিছু করে, জাগিয়া উঠিবার পর কিন্তু তাহার আর সে-সব কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু ফ্রয়েড লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, জাগ্রৎ অবস্থায় এইরূপ লুপ্ত-স্মৃতি উদ্ধারের জন্য ব্যেরন্‌হাইম একটি উপায় অবলম্বন করিতেন। যে-ব্যক্তির লুপ্ত স্মৃতি উদ্ধার করিতে হইবে, হাত দিয়া তাহার কপাল ঈষৎ চাপিয়া যদি বারবার বলা যায় যে সংবেশিত অবস্থার সব ঘটনা তাহার মনে পড়িবে, তবে বাস্তবিকই বিস্মৃত ঘটনাগুলি তাহার স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠে। ইহা একপ্রকার suggestion

বা অভিভাব মাত্র। ফ্রয়েড তাই ঠিক করিলেন, রোগীকে সংবেশিত না করিয়া ব্যেরনহাইমের প্রক্রিয়া-মত ভবিষ্যতে তিনি বাল্যকালের লুপ্ত স্মৃতি জাগাইবার চেষ্টা করিবেন। তিনি রোগীকে শোয়াইয়া তাহার কপালে হাত রাখিয়া বলিলেন, "আমি তোমার কপালে ঈষৎ চাপ দিতেছি, সেই স্পর্শে তোমার মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিবে।"

রোগী প্রথমে জানাইল, তাহার কোন কথাই মনে আসে না। ফ্রয়েড বলিলেন, "যে কথাই তোমার মনে উঠুক অকপটে বলিয়া যাও।" এইরূপে রোগীর নিকট হইতে যে-সব কথার সন্ধান পাওয়া গেল, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহার মধ্যে লুপ্ত স্মৃতির আভাস রহিয়াছে দেখা গেল। এইরূপেই অবাধ-ভাবানুষঙ্গ-ক্রমের (Free Association Method) উৎপত্তি।

ক্রমে রোগীর স্বপ্নের দিকে ফ্রয়েডের দৃষ্টি পড়িল। তাঁহার মনে হইল, গতজীবনের অনেক ঘটনার আভাস রোগীর স্বপ্নে পাওয়া সম্ভব। তখন তিনি অবাধ-ভাবানুষঙ্গ-ক্রমে রোগীর স্বপ্ন-বিশ্লেষণে নিবিষ্ট হইলেন।

অবাধ-অনুষঙ্গ-ক্রমে এমন কতকগুলি তথ্য আবিষ্কৃত হইল, যাহা সহজে বিশ্বাস করিতে মন সরে না। বলা বাহুল্য মনে কোন বদ্ধমূল ধারণা লইয়া ফ্রয়েড

স্বপ্ন-বিশ্লেষণ সুরু করেন নাই, কেবল অনুসন্ধানের ফলে যে-যে বিষয়ের উপযুক্ত প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যগুলি শুধু যে রোগীদের স্বপ্ন-বিচারের উপরই প্রতিষ্ঠিত তাহা নহে—অনেক সুস্থ ব্যক্তির স্বপ্ন-পরীক্ষার দ্বারাও তাঁহার সিদ্ধান্ত-সমূহ প্রমাণিত ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। ফ্রয়েড বলেন, প্রত্যেক স্বপ্নেই মনের কোন-না-কোন ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে চরিতার্থতালাভ করে। কথাটা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না বটে, কিন্তু কোন কথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা না থাকিলেই যে তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইবে, এরূপ বলা অসঙ্গত। কাজেই স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া যদি আমাদের ফ্রয়েডের সিদ্ধান্তেই আসিতে হয়, তবে তাহা না মানিয়া উপায় নাই। ফ্রয়েডের সমালোচকগণ আয়াসসাধ্য স্বপ্ন-বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়াই, তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যগুলিকে অসার বলিতে চান। অবশ্য যদি কেহ বহুসংখ্যক স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিবার পর অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তবে তাহা মানিয়া লইতেই হইবে। এইরূপ অনুসন্ধানের ফলেই সম্প্রতি ফ্রয়েড তাঁহার পূর্ব্ব মত কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন কোন স্বপ্নে ইচ্ছার কাল্পনিক পরিতৃপ্তি না ঘটিতেও

পারে। এ বিষয়ে আমি কিন্তু ফ্রয়েডের সহিত এখনও একমত হইতে পারি নাই। আমার ধারণা কি জাগ্রৎ কি স্বপ্নাবস্থায়, ইচ্ছা-পূরণের চেষ্টাকে আশ্রয় না করিয়া কখনও কোন চিন্তাধারাই চলিতে পারে না। কামনাই চিন্তার মূল। কাজেই ফ্রয়েডের প্রথম মত পরিবর্ত্তন করিবার মত কোন সঙ্গত কারণ দেখিতেছি না। যে নূতন পর্য্যবেক্ষণের ফলে ফ্রয়েড তাঁহার প্রথম মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, আমার মতে তাহার অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করাও চলে। বিষয়টি জটিল, এই কারণে সাধারণের নিমিত্ত লিখিত এই পুস্তকে তাহার আলোচনা করিলাম না।

ফ্রয়েড অনেক স্বপ্নের মূলেই কামজ ইচ্ছার সন্ধান পাইয়াছেন। এ কথাও মানিয়া লইতে অনেকের ঘোর আপত্তি আছে। এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলি যখন 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়, তখন কেহ কেহ জানাইয়াছিলেন যে, স্বপ্নে কামজ ইচ্ছার প্রভাব আমি না-কি অতিমাত্রায় বর্ণনা করিয়াছি। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়াছেন কিনা বলেন নাই।

আর একটা বিষয়ে পাঠকের আপত্তি দেখা যায়। স্বপ্নে যে এক বস্তু অপর বস্তুর প্রতীকরূপে দেখা দিতে পারে, ইহা অনেকেই স্বীকার করিতে চান না। কিন্তু

যিনি একটু কষ্ট করিয়া স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিবেন তিনিই বুঝিবেন, স্বপ্নে প্রতীকের বাহুল্য কতটা। পাঠককে আমার অনুরোধ, বিনা-বিচারে তিনি যেন পুস্তকে বর্ণিত কোন কথা অগ্রাহ্য না করেন।

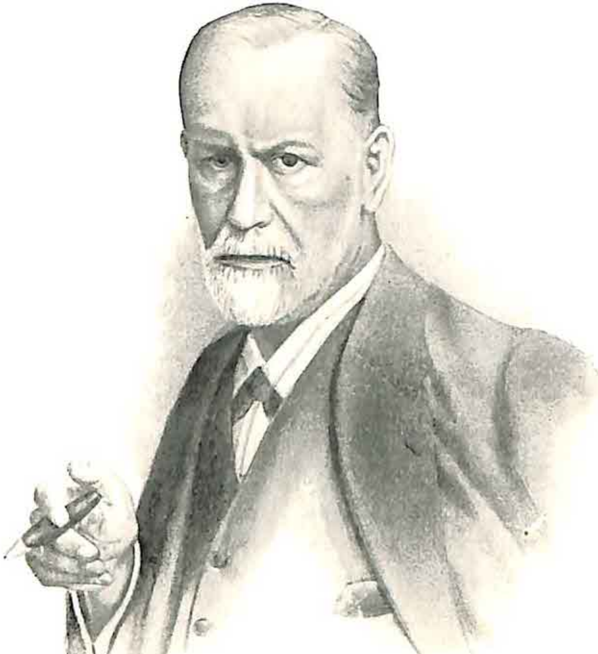
বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে বসিলে উপযুক্ত পরিভাষার অভাব পদে পদে অনুভব করিতে হয়। আমি যে পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছি, তাহা যে বিষয়ের খুব উপযুক্ত হইয়াছে, এমন কথা বলি না। আশা করি, ভাবী লেখকগণ এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া পরিভাষার উন্নতিসাধন করিবেন। বর্ত্তমানে পরিভাষার জন্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন, মহেশচন্দ্র ঘোষ, রঙীন হালদার, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য বন্ধুবর্গের নিকট আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার অকাতর সাহায্য ব্যতীত এই পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ।

সূচীপত্র

সিগমুণ্ড্ ফ্রয়েড্

ফটো হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন

অঙ্কিত পেনসিল চিত্র



Freud

স্বপ্ন

[illegible]

স্বপ্ন দেখেন না, এমন লোক খুব কমই আছেন। জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, তাঁহারা স্বপ্ন দেখেন না। কিন্তু স্বপ্নের প্রকৃতিই এই, তাহা মনে থাকে না। তাই সারা রাত স্বপ্ন দেখিয়াও সকালবেলা মনে হইতে পারে, স্বপ্ন দেখি নাই। এমন স্বপ্নও আছে, যাহা কিছুতেই ভুলিতে পারা যায় না। আমি এমন লোকও জানি, যিনি তিন বৎসর বয়সে দেখা স্বপ্ন ৫৬ বৎসর বয়সেও মনে রাখিতে পারিয়াছেন। স্বপ্ন-জগতের সহিত বাস্তব জগতের পার্থক্য সময় সময় এতই বেশী হয়, [illegible] রকমের স্বপ্ন [illegible] বিস্তর ভাবিয়া [illegible] অনেক সময় [illegible] দেখা যায়, [illegible]


Freud

স্বপ্ন

উপক্রমণিকা

স্বপ্ন দেখেন না, এমন লোক খুব কমই আছেন। জিজ্ঞাসা করিলে কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, তাঁহারা স্বপ্ন দেখেন না। কিন্তু স্বপ্নের প্রকৃতিই এই, তাহা মনে থাকে না। তাই সারা রাত স্বপ্ন দেখিয়াও সকালবেলা মনে হইতে পারে, স্বপ্ন দেখি নাই। এমন স্বপ্নও আছে, যাহা কিছুতেই ভুলিতে পারা যায় না। আমি এমন লোকও জানি, যিনি তিন বৎসর বয়সে দেখা স্বপ্ন ৫৬ বৎসর বয়সেও মনে রাখিতে পারিয়াছেন। স্বপ্ন-জগতের সহিত বাস্তব-জগতের পার্থক্য সময় সময় এতই বেশী হয়, আর স্বপ্ন এমনই উদ্ভট রকমের হয় যে, সকলেই, স্বপ্ন কি ও কেন হয়, অল্প-বিস্তর ভাবিয়া থাকেন। অসভ্য জাতিরা স্বপ্ন দেখিয়া অনেক সময় তদনুসারে কার্য্য করে। ইতিহাসেও দেখা যায়, স্বপ্ন দেখিয়া অনেক রাজা যুদ্ধযাত্রা

করিতেন। চিতোরের মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহ স্বপ্নে উবর-দেবীর আদেশ পাইয়া আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছিলেন। বাদ্‌শা জাহাঙ্গীর স্বপ্নে পিতার আদেশ পাইয়া, আজিজ কোকার গুরুতর অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছিলেন। স্বপ্নে ঘোড়ার নাম পাইয়া অনেকে ঘোড়দৌড়ে বাজী ধরেন। কখন কখন স্বপ্ন-দেখার ফলে পাটের ভিতর-বাজারের তেজী মন্দী বা পাটের দর কমে বাড়ে। কোন ধনী মারোয়াড়ী স্বপ্ন দেখিলেন, বাজার তেজী হইবে। তাঁহার সেই স্বপ্নের কথা শুনিয়া আর পাঁচজনের মনেও সেই ধারণা বদ্ধমূল হইল। বাজার সত্য সত্যই তেজী হইল। এই-সকল অবস্থায় মানুষ যে স্বপ্নকে নিতান্ত অমূলক চিন্তা বলিয়া মনে করে নাই, তাহা না বলিলেও চলে। অধিকাংশ লোকেরও ধারণা, স্বপ্ন অমূলক নহে—তাহার একটা-না-একটা অর্থ আছে। তাই আমাদের দেশে সুস্বপ্ন দুঃস্বপ্ন ও স্বপ্নের ফলাফল লইয়া এত বিচার। বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বলে আমরা স্বপ্নকে 'কিছুই নয়' বলিয়া উড়াইয়া দিই বটে, তবু স্বপ্ন যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের হৃদয়ে উদ্দীপনা আনিয়া দেয়, এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায়

না। সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশেও স্বপ্নবিষয়ক গ্রন্থের অভাব নাই। এই-সব কেতাবে নানা রকমের স্বপ্ন ও তাহার ফলাফল লেখা আছে। সাপের স্বপ্ন দেখিলে ছেলে হয়, ইহা আমাদের দেশের প্রাচীন কথা। এইরূপ, স্বপ্নে জলপূর্ণ পাত্র দেখিলে ধনলাভ, লাল ফুল দেখিলে কষ্টভোগ, ইত্যাদি বিবরণ আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়।

আধুনিক পাশ্চাত্য স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে স্বপ্নের কারণ-নির্ণয়ের দুইটি ধারা আছে। একদল স্বপ্নের কারণ শারীরিক মনে করেন। আর একদল অনুমান করেন, স্বপ্নের কারণ মনের মধ্যেই আছে। ঘুমন্ত অবস্থায় আমার গায়ে এক ফোঁটা জল পড়িল, আমি স্বপ্ন দেখিলাম বৃষ্টি হইতেছে, অথবা স্নান করিতেছি। এক্ষেত্রে প্রথম দলের বৈজ্ঞানিক বলিবেন, গায়ে জল-পড়ার শারীরিক অনুভূতিই আমার স্বপ্ন-দর্শনের কারণ; দ্বিতীয় দল আপত্তি করিবেন, জল-পড়ার অনুভূতি স্বপ্ন সৃষ্টি করিলেও, বৃষ্টির স্বপ্ন দেখিব, কি স্নানের স্বপ্ন দেখিব, তাহা এরূপ অনুভূতির দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না; ইহার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে মন

অনুসন্ধান করিতে হইবে। নিমন্ত্রণে গুরু আহার করিয়া রাত্রে ভয়ের স্বপ্ন দেখিলাম; স্বপ্নে বাঘ দেখিব, চোর দেখিব, কি ভূত দেখিব, তাহা আমার মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। এজন্য শারীরিক অপেক্ষা, মানসিক কারণ অনুসন্ধানে অধিক ফললাভের সম্ভাবনা।

কোন কোন শারীরক্রিয়াবিৎ মনে করেন, আমাদের মস্তিষ্ক-মধ্যস্থিত কোষের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনের ফলে মানসিক চিন্তার উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন কোষগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকে। নিদ্রাকালে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, এইজন্য চিন্তাধারার শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া স্বপ্নের সৃষ্টি করে। আশ্চর্য্যের কথা এই, আর একদল শারীরক্রিয়াবিৎ ইহার ঠিক বিপরীত কথা বলেন। তাঁহাদের মতে নিদ্রাবস্থায় কোষগুলির সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হইয়া বরং আরও ঘনিষ্ঠ হয়; তাহারই ফলে স্বাভাবিক চিন্তার বিভিন্ন ধারা বিমিশ্রিত হয়,—আমরা স্বপ্ন দেখি। আবার কেহ কেহ বলেন, নিদ্রাকালে শরীরের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ জমিয়া কোষগুলির ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়, আর তাহাতেই আমরা স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। স্বপ্নের কারণ-নির্ণয়ের জন্য এমনই কত রকমের শারীরক্রিয়ামূলক মত যে চালানো হইয়াছে, তাহার

ইয়ত্তা নাই। মোট কথা, এই-সকল মতের কোনটাই প্রকৃত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। কেহই এরূপ সংযোগ-বিয়োগ বা বিষক্রিয়া চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন নাই; আর এরূপ অনুমানের দ্বারা স্বপ্নতত্ত্ব বুঝিবারও বড় সুবিধা হয় নাই।

আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রেও স্বপ্নের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা রকমের বিচার আছে। এ বিষয়ে বৃহদ্ আরণ্যক উপনিষদে স্বপ্ন-সম্পর্কে দুইটি মত আছে। (১) আত্মা বহির্জগতে দৃষ্ট দ্রব্যাদির অনুকরণে স্বপ্নে নূতন জগৎ সৃষ্টি করে। (২) আত্মা, শরীর হইতে বাহির হইয়া ইচ্ছামত পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়ায়। 'চরক' বলেন, স্বপ্ন সাত প্রকার—দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত, প্রার্থিত, কল্পিত, ভাবিক (ভবিষ্যৎ-নির্দ্দেশক) ও দোষজ। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি কোনও ফলাফল সূচিত করে না। বেদান্ত বলেন, স্বপ্নে-দেখা কোন বিষয়ই আমাদের অজানিত নয়। এই-সকল বিচারের কোনটিকেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলা চলে না।

স্বপ্নতত্ত্ব জানিবার জন্য সবাই উৎসুক, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, খুব কম বৈজ্ঞানিক ইহার আলোচনা করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিকদের কারবার নির্দ্দিষ্ট

জিনিষ লইয়া। তাই বোধ হয়, তাঁহারা অবাস্তব, অদ্ভুত, আজ্গবী স্বপ্নরাজ্যে যাইতে নারাজ। মনোবিদেরা অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণে যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার তুলনায় স্বপ্ন সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই করেন নাই। তাই কিছুদিন আগেও এ-সম্বন্ধে আমাদের কোনও নিশ্চিত জ্ঞান ছিল না। প্রায় ৩০ বৎসর হইতে চলিল, প্রোফেসর সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (Prof. Sigmund Freud) অশেষ অধ্যবসায় ও অদ্ভুত বুদ্ধিবলে স্বপ্নের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করেন। সেই অবধি তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনেক মনোবিৎ পণ্ডিত স্বপ্নের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তবুও বলিতে হইতেছে, স্বপ্ন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ। তবে, আমরা স্বপ্নের রহস্য যে ক্রমেই অধিকতর স্পষ্টভাবে বুঝিতেছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি এই পুস্তকে স্বপ্ন-সম্বন্ধে ফ্রয়েডের গবেষণা ও অপরাপর মনোবিদ্‌গণের মতামত কিছু কিছু আলোচনা করিব। সেই সঙ্গে আমার নিজের মন্তব্যও দিব।

স্বপ্নতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে আমাদের মনে কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হয়। স্বপ্ন কি, কেন

হয়, ইহার অর্থই বা কি? স্বপ্ন সত্য কি না? ইহা কি আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ ঘটনার সন্ধান বলিয়া দিতে পারে? স্বপ্ন-সাহায্যে কি আমরা পরজগতের কথা জানিতে পারি? মৃত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের আত্মা বাস্তবিকই কি স্বপ্নে আসিয়া দেখা দেয়? কখনও কখনও স্বপ্নে আমরা কাহারও কাহারও মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস পাই, ইহাই বা কিরূপে সম্ভবে? স্বপ্নে কোন অচেনা জায়গা বা অজানা বিষয় দেখিয়া পরে তাহা প্রত্যক্ষ করি, ইহারই বা কারণ কি? এই-সকল প্রশ্ন কখনও কখনও আপনা হইতে আমাদের মনে উপস্থিত হয়। এ-সকলের সম্যক্ উত্তর দুরূহ। তথাপি যথাসাধ্য প্রয়াস করিতেছি।

স্বপ্ন কি

নিদ্রাকালে আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি একেবারে নিস্তেজ হয় না; কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় যে শৃঙ্খলা মানসিক বৃত্তিতে লক্ষিত হয়, তাহা নষ্ট হইয়া যায়; নানারূপ অদ্ভুত চিন্তা ও দৃশ্য মনোমধ্যে উদিত হয়। ইহাকেই স্বপ্ন বলে। শাস্ত্রকারেরা যাহাকে সুষুপ্তি বলেন, নিদ্রার সেই গাঢ় অবস্থায় স্বপ্ন-দর্শন হয় না। অন্ততঃ আমরা এইরূপই মনে করিয়া থাকি। স্বপ্নের একটি বিশেষত্ব আছে। জাগ্রদবস্থায় চিন্তাধারার মধ্যে দার্শন (visual), শ্রাবণ (auditory), স্পার্শন (tactual) ইত্যাদি প্রত্যক্ষের প্রতিরূপ (image) বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু স্বপ্নে দার্শন প্রতিরূপই (visual imagery) অধিক থাকে। স্বপ্নে শোনা শোঁকা অপেক্ষা দেখার ভাগই অধিক। তাই চল্‌তি কথায় আমরা বলি—'স্বপ্ন দেখা'। স্বপ্নের এই বিশেষত্ব কেন, ইহার অর্থই বা কি, সে কথা পরে বলিব।

জাগ্রৎ ও সুপ্ত অবস্থার মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা-রেখা নাই। এই কারণে জাগরণ ও নিদ্রাকালের

চিন্তাধারার মধ্যেও সকল সময়ে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায় না। কখন কখন এমনও ঘটে, জাগ্রৎ অবস্থায় চিন্তা করিতেছি, কি স্বপ্ন দেখিতেছি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বাস্তবিক, সম্পূর্ণ জাগ্রৎ অবস্থাতেও অনেক সময় স্বপ্নের ন্যায় চিন্তাধারা চলিতে থাকে। ইহাকে আমরা দিবা-স্বপ্ন বা জাগর-স্বপ্ন বলি। জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করি—এইরূপ মনে হয়। স্বপ্নের সময় চিন্তাধারা আমাদের ইচ্ছামত চালিত হয় না, ইহাও স্বপ্নের একটা বিশেষত্ব। দিবা-স্বপ্নেও চিন্তাধারা এইরূপ ইচ্ছা ব্যতিরেকে চলিতে থাকে, আপনা আপনি মনোমধ্যে নানা ভাব বা চিন্তার উদয় হয়। নিজের স্বপ্ন ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে, দেখা যাইবে যে, তাহা সময়-সময় আমরা ইচ্ছামত চালনা করিয়া থাকি। আমি অনেক সময়েই স্বপ্নের গতি ইচ্ছামত ফিরাইতে পারিয়াছি; আমার মতন আরও অনেকেই বোধ হয় ইহা পারেন। ইহা যেন কতকটা ইচ্ছা করিয়া স্বপ্ন-দেখা। অনুভূতি ছাড়া এ অবস্থার ধারণা করা কঠিন। উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, সাধারণতঃ নিদ্রিত ও জাগ্রত চিন্তাধারা

পৃথক হইলেও, এমন অনেক অবস্থা আছে, যেখানে জাগরণ কি স্বপ্ন বুঝিয়া উঠা দায়। স্বপ্নে দার্শন (visual) ব্যতীত অন্য প্রতিরূপের (imagery) অভাব হইলেও সুখ-দুঃখ-বোধের (feelings) অভাব হয় না। শোক দুঃখ, সুখ আনন্দ, ক্রোধ ভয়, ইত্যাদি সব-রকম মনোভাব স্বপ্নে পাওয়া যায় ;—যদিও অনেক সময়েই এগুলি নিতান্ত অসঙ্গত। ধরুন, স্বপ্নে বাঘ দেখিলাম ; কিন্তু ভয় পাওয়া দূরের কথা, তাহার সহিত স্ফূর্ত্তিতে গল্প জুড়িয়া দিলাম। অন্যদিকে, স্বপ্নে কোন পরিচিত বন্ধুকে দেখিয়া হয় ত খুব ভয় করিতে লাগিল। আপাতদৃষ্টিতে এই দুই ক্ষেত্রেই আমার স্ফূর্ত্তি ও ভয় অসঙ্গত। স্বপ্নের ঘোরে কেহ কেহ সময়ে-সময়ে কথা কহিতে বা চলিয়া বেড়াইতে থাকেন। ইহাকে 'নিশিতে পাওয়া' বলে। আমার এক বন্ধু আছেন। তিনি ঘুমাইলেই কথা কহিতে থাকেন। স্বপ্নাবস্থায় সব সময়েই যে চিন্তাধারা বিশৃঙ্খল হয়, এমনও নহে,—অনেকে স্বপ্নে কঠিন আঁক কষিয়াছেন, ইহা খুবই জানা কথা। Coleridge স্বপ্নে তাঁহার বিখ্যাত কবিতা Kubla Khan লেখেন। দুঃখের বিষয় ইহা অসম্পূর্ণ। শুনিতে পাই, আমাদের রবীন্দ্রনাথও স্বপ্নে কোন

কোন কবিতা লিখিয়াছেন। * অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও স্বপ্নে হইয়াছে।

স্বপ্নকে আমরা সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। (১) যে-সব স্বপ্নে কোনরূপ অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকতা নাই। সাধারণ জাগ্রত চিন্তাধারার সহিত এই শ্রেণীর স্বপ্নের বাহ্যতঃ কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। যেমন, স্বপ্নে দেখিলাম আমি গড়ের মাঠে বেড়াইতে গিয়াছি। ইহাতে কোন অসম্ভব বা অস্বাভাবিক ভাব নাই। (২) যে-সকল স্বপ্নে ভাবের অসঙ্গতি না থাকিলেও বাস্তব-জীবনের সহিত কোন মিল নাই। ধরুন, স্বপ্নে দেখিলাম, আমি মরিয়া গিয়াছি। (৩) যে-সব স্বপ্ন একেবারে অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত। যেমন, স্বপ্নে দেখিলাম একটা তিন-পা-ওয়ালা সাপ আমার সহিত কথা কহিতেছে। এই ধরণের স্বপ্ন ঘুম ভাঙ্গিবার পর অদ্ভুত ঠেকিলেও স্বপ্ন-

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'রাজর্ষি' উপন্যাসে মন্দির-সোপানে রক্তের কাহিনী ও শিশুর মুখে 'এত রক্ত কেন ?' কথাটি পর্য্যন্ত স্বপ্ন-দৃষ্ট। তাঁহার সর্ব্বজন-পরিচিত 'গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা' গাথার উপাখ্যান-ভাগ, এমন কি কাব্যাংশ পর্য্যন্তও স্বপ্নে প্রাপ্ত।

দেখার সময় তাহার অস্বাভাবিকত্ব প্রায়ই ধরা পড়ে না। ছোট ছেলের স্বপ্ন সাধারণতঃ প্রথম প্রকারের। অনেকে বলেন, অসভ্য জাতিদের মধ্যে বয়স্ক লোকের স্বপ্নও নাকি এইরূপ হইয়া থাকে। মোটামুটি বলিতে গেলে, স্বপ্নকে আমরা নিদ্রাবস্থার চিন্তাধারা বলিতে পারি। এই চিন্তাধারার সহিত জাগ্রদবস্থার চিন্তাধারার প্রভেদ কি, তাহা 'স্বপ্নের বিশেষত্ব' প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

স্বপ্ন কেন হয়

বিজ্ঞানে 'কেন'র সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, বিজ্ঞান আদিকারণ অনুসন্ধান করে না; আদিঅনুসন্ধান দর্শনশাস্ত্রের কাজ। আগেই বলিয়াছি, স্বপ্ন নিদ্রাবস্থার চিন্তামাত্র। ঘুমন্ত অবস্থায় কেন আমরা চিন্তা করি, এ কথা জানিতে হইলে, জাগ্রৎ অবস্থায় চিন্তার কারণও বুঝা দরকার। কিন্তু এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর আমার জানা নাই। সাধারণের বিশ্বাস, আমরা স্বপ্নে ভূত-ভবিষ্যতের আভাস পাই; শিক্ষিত ব্যক্তিরা কিন্তু এ কথা মানিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র; স্বপ্নের কোন কারণ থাকিতে পারে না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক মনোবিৎও স্বপ্নের কারণ অনুসন্ধান করিতে রাজি নন। আমরা কেন স্বপ্ন দেখি, বোধ হয় ফ্রয়েডই তাহার একমাত্র সঙ্গত কারণ দেখাইতে পারিয়াছেন। তাঁহার মতে, আমাদের দৈনন্দিন অনেক কাজ আর সেই সঙ্গে অনেক চিন্তাধারা সম্পূর্ণতা লাভ করে না; এই অসম্পূর্ণ চিন্তাধারাই স্বপ্নে

পূর্ণতালাভের চেষ্টা করে। আমাদের যে-সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই, বা হইবার পথে বাধা আছে, সেই-সব ইচ্ছা স্বপ্নে কাল্পনিকভাবে পরিতৃপ্ত হয়। কোন ইচ্ছা বা চিন্তা অসম্পূর্ণ থাকিলে মনে যে অশান্তির উদয় হয়, স্বপ্নে কল্পনার দ্বারা তাহারই শান্তি হয়। মনের অশান্তি দূর করে বলিয়া স্বপ্ন নিদ্রার সহায়। ফ্রয়েড তাই স্বপ্নকে guardian of sleep বলিয়াছেন। সাধারণের ধারণা, স্বপ্ন দেখিলে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। কিন্তু ফ্রয়েডের মত ঠিক উল্টা; তিনি বলেন, নিদ্রার বিঘ্ন হইলে স্বপ্নের সৃষ্টি হয়, আর এই স্বপ্ন দেখার ফলে সুনিদ্রা বরং অনেকস্থলে সম্ভব হইয়া থাকে। ধরুন, রামবাবু আপিসের কেরাণী। হাতে অনেক কাজ জমায় তাঁহাকে সাহেবের বকুনি ও লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইয়াছে। তিনি ঘুমাইতে চেষ্টা করিলে কি হয়, আপিসের কাজকর্ম্মের চিন্তাই বারবার মনে আসিয়া, তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইল। এই অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, আপিসের সব কাজ তিনি সারিয়া ফেলিয়াছেন। সাহেব খুশী হইয়া তাঁহার মাহিনা বাড়াইয়া দিয়াছেন। এইরূপ স্বপ্ন দেখার ফলে রামবাবুর মনে শান্তি আসিল,

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিদ্রাও সুগম হইল। তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, এ ক্ষেত্রে স্বপ্ন সুনিদ্রার সহায়তা করিল। দারুণ গ্রীষ্মে নিদ্রা গিয়াছি; নিদ্রিত অবস্থায় বড়ই পিপাসা পাইল। ইহাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা; কিন্তু স্বপ্নে দেখিলাম, আমি আকণ্ঠ সরবৎ খাইতেছি। ইহার ফলে যে কাল্পনিক তৃপ্তি হইল, তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিল না। অবশ্য এই কাল্পনিক তৃপ্তি বেশীক্ষণ স্থায়ী না হইতে পারে। এই ধরণের স্বপ্ন হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, স্বপ্ন নিদ্রার সহায়। অনেকে হয় ত বলিবেন, এমন অনেক স্বপ্ন আছে, যাহা দেখিলে ভয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। এ অবস্থায় আপাতদৃষ্টিতে স্বপ্নকে নিদ্রার বিঘ্ন বলিয়াই মনে হয়। ভয়ের স্বপ্ন সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব। অনেক স্বপ্নেই কিন্তু আমাদের অতৃপ্ত ইচ্ছা সোজাসুজি চরিতার্থ না হইয়া, গুপ্তভাবে পরিতৃপ্ত হয়; যথা, রসগোল্লা খাইবার ইচ্ছা হওয়ায় স্বপ্নে দেখিলাম বাগবাজারে বেড়াইতে গিয়াছি। এরূপ স্বপ্নে কি ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে, তাহা বিশ্লেষণ ভিন্ন ধরা পড়ে না। ফ্রয়েড বলেন, আমাদের প্রত্যেক স্বপ্নেই কোন-না-কোন ইচ্ছা পূর্ণতালাভের চেষ্টা করে। তাঁহার মতে, স্বপ্ন-

দেখায় আমাদের দুইটি লাভ হয়। (১) মনের অনেক অসম্পূর্ণ ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে পরিতৃপ্ত হইয়া মনে শান্তি আনে ও (২) অনেক স্থলে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘুচাইয়া দেয়।

স্বপ্নের অর্থ কি

স্বপ্নের অর্থ লইয়া অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা আছে। আগেই বলিয়াছি, কাহারও কাহারও মতে স্বপ্ন একেবারেই নিরর্থক। আমাদের দেশে কেহ কেহ স্বপ্ন দেখিয়া তাহা গণকের নিকট ব্যক্ত করেন, আর গণক-মহাশয় পাঁজিপুঁথি উল্‌টাইয়া তাহার অর্থ করিয়া দেন। সংস্কৃত গ্রন্থে স্বপ্নের ফলাফল-কথাও বর্ণিত আছে। ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ ও সামবেদের কোন কোন শ্লোকে স্বপ্নের বিবরণ পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদের মতে কতকগুলি স্বপ্ন অফল; আবার কতকগুলির শুভাশুভ ফল আছে। শাস্ত্রকারেরা বলেন, শুভ স্বপ্ন দেখিলে সে রাত্রে আর নিদ্রা না যাওয়াই উচিত। এরূপ করিলে স্বপ্নের শুভফল ফলিয়া থাকে। অশুভ স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গিলে, পুনরায় না ঘুমানই ভাল। ঘোড়ায় চড়া, হাতীতে চড়া বা পাহাড়ে উঠিবার স্বপ্ন দেখিলে ফলং—অর্থলাভ। নরমাংস আহার করার স্বপ্ন দেখিলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ফলবতী হয়। স্বপ্নে পরিপূর্ণ জলপাত্র দেখিলে ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ। স্বপ্নে হাসিলে

ধরাতে দুঃখভোগ। মহিষে চড়িয়া দক্ষিণ দিকে যাইবার স্বপ্ন দেখিলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। দাঁত ভাঙ্গিবার স্বপ্ন দেখিলে অর্থনাশ।—ইত্যাদি।

স্বপ্নের এই ধরণের ব্যাখ্যা পাশ্চাত্য দেশেও প্রচলিত আছে। বিলাতেও **স্বপ্নতত্ত্ব** লইয়া অনেক পুস্তক রচিত হইয়াছে; এই-সব কেতাবে স্বপ্নের অর্থ দেওয়া আছে। বলা বাহুল্য, বৈজ্ঞানিক হিসাবে এরূপ আলোচনার বিশেষ মূল্য নাই।

ফ্রয়েডই সর্ব্বপ্রথম স্বপ্নের সঙ্গত ব্যাখ্যা নির্ণয়ের পন্থা আবিষ্কার করেন। মনোবিদ্‌গণের মধ্যে স্বপ্ন-ব্যাখ্যার এই উপায় ক্রমশঃ আদৃত হইতেছে। এই উপায়ের নাম Free Association Method বা অবাধ-ভাবানুষঙ্গ-ক্রম। **স্বপ্নদ্রষ্টা** স্বপ্ন দেখিবার পরই যথাসম্ভব শীঘ্র স্বপ্নটি লিখিয়া রাখেন। স্বপ্নের একটি বিশেষত্ব এই, আমরা অতি শীঘ্র স্বপ্ন ভুলিয়া যাই; তাই লিখিয়া রাখা দরকার। স্বপ্নদ্রষ্টাকে নির্জ্জন ঘরে বিছানার উপর শোয়ান হয়। ব্যাখ্যাকারী তাঁহার মাথার কাছে কাগজ-পেন্সিল লইয়া বসেন। প্রথমে স্বপ্ন-সম্বন্ধে দ্রষ্টা যে-সকল সংবাদ দিতে পারেন, সেগুলি লেখা হয়। স্বপ্ন-সংক্রান্ত কোন ঘটনা বাস্তবিক

ঘটিয়াছিল কি না, কেন স্বপ্নদর্শন হইল, স্বপ্নে দৃষ্ট ব্যক্তিগণ কে কে, আর তাহাদের সহিত দ্রষ্টার সম্বন্ধই বা কি—এই সব সংবাদ এইরূপে প্রথমে জানা হয়। তারপর স্বপ্নদ্রষ্টাকে চোখ বুজিয়া একেবারে নিশ্চেষ্টভাবে শুইতে বলা হয়। স্বপ্নটি বড় হইলে, তাহাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা দরকার। দ্রষ্টাকে প্রথম হইতে এক একটি অংশ পর-পর শোনান হইয়া থাকে। প্রত্যেক অংশ শুনিবার পর, তাঁহার মনে কি কথা, বা কি ভাবের উদয় হয়, তাহা তাঁহাকে বলিতে হয়। দ্রষ্টাকে বিশেষ করিয়া বলা হয়, তিনি যেন কোন ভাব বা কথা রাখিয়া-ঢাকিয়া না বলেন ; শ্লীল-অশ্লীল, উচিত-অনুচিত, আবশ্যক-অনাবশ্যক, সব কথাই যেমন মনে আসিবে অকপটে বলিয়া যাইবেন। ব্যাখ্যাকারী সকল কথাই লিখিয়া লন। অনেক সময়ে দ্রষ্টার মনে এমন-সব ভাব বা কথার উদয় হয়, যাহার সহিত আপাতদৃষ্টিতে স্বপ্নের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। দ্রষ্টা ইচ্ছা করিয়া কিছুই ভাবিতে পারিবেন না ; যাহা মনে আসিবে, তাহাই বলিতে হইবে। মনের লাগাম একেবারে আল্‌গা করিয়া দেওয়া দরকার। মনকে এরূপভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যে কতটা শক্ত, পাঠক তাহা একবার

পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। মনের নিশ্চেষ্টতা না আসিলে স্বপ্নের ব্যাখ্যা পাওয়া অসম্ভব। স্বপ্নদ্রষ্টার জীবনের সমস্ত ঘটনা জানা না থাকিলে, অনেক সময়ে স্বপ্নের অর্থ বাহির করা কঠিন হইয়া পড়ে। মোট কথা, স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা সোজা নহে। দ্রষ্টার সম্বন্ধে সমস্ত খবর ও তাঁহার স্বপ্নের খাঁটি বিবরণ লইয়া, পরে অবাধ-ভাবানুষঙ্গের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ায় বিশেষ ধৈর্য্য ও সময়ের দরকার।

পাঠক হয় ত মনে করিবেন, সঙ্কেত জানা থাকিলেই স্বপ্নের অর্থ করা সহজ। তা ছাড়া স্বভাবতঃ তিনি এরূপ গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে যাইতে রাজি হইবেন না। কিন্তু ধৈর্য্যসহকারে কিছুদিন বন্ধুবান্ধবের স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিলে, তিনি যে মানুষের মনের অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিবেন, তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি। স্বপ্ন-বিশ্লেষণে অভ্যস্ত হইলে, এই কঠিন পদ্ধতির সাহায্য ব্যতিরেকেও অনেক সময় স্বপ্নের মোটামুটি অর্থ বুঝা যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে ভুলের সম্ভাবনাই বেশী। দুইজন লোকের একই রকমের স্বপ্নের দুইরূপ অর্থ হওয়া বিচিত্র নয়।

অবাধ-ভাবানুষঙ্গ-ক্রম

ফ্রয়েড্ বলেন, অবাধ-ভাবানুষঙ্গ দ্বারা আমাদের মনের অনেক লুকানো ভাব ফুটিয়া বাহির হয়; আর তাহা হইতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই মনের ধারা ও স্বপ্নের অর্থ বুঝিয়া লইতে পারেন। স্বপ্ন খুব ছোট হইলেও তাহার সহিত মনের অনেক চিন্তাই যে বিজড়িত থাকে, তাহা এই উপায়ে বেশ বুঝা যায়। স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, ফ্রয়েড তাহার নাম দিয়াছেন ব্যক্ত অংশ—Manifest Content। আর স্বপ্নের সহিত সংশ্লিষ্ট মনের যে-সব চিন্তা বা গুপ্ত ভাবের আভাস পাওয়া যায়, তাহা স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ—Latent Content। এই অব্যক্ত অংশের সন্ধান না মিলিলে স্বপ্নের অর্থ বাহির করা অসম্ভব।

একটা বাস্তব উদাহরণ দিয়া এই অবাধ-ভাবানুষঙ্গ এবং স্বপ্নের ব্যক্ত ও অব্যক্ত অংশ বুঝাইতেছি।

"ক"-বাবু আমার এক বন্ধু। তিনি চিত্রশিল্পী ও ফটোগ্রাফার। তাঁহার পিতার অবস্থা ভাল। "ক"-বাবুকে পয়সা রোজগারের ভাবনা ভাবিতে হয় না।

কাজের মধ্যে কেবল খোস্‌খেয়ালে ফটোগ্রাফ-তোলা, আর ছবি-আঁকা। তাঁহার একটি চিত্রশালা আছে। "ক"-বাবুর প্রকৃতি অতি নিরীহ; আমরা তাঁহাকে কখনও রাগিতে দেখি নাই। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে তাঁহার একটা স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিতে বলেন। স্বপ্নটি জানিতে চাহিলে, তিনি বলিলেন, "সম্প্রতি কোন স্বপ্ন দেখেছি বলে মনে হয় না। তবে মাস-তিনেক আগে একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম; তার খানিকটা এখনও মনে আছে।" নিম্নে স্বপ্নটি ও তাহার বিশ্লেষণ দিলাম। কিন্তু এই বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ। বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে হয় ত স্বপ্নের আরও অনেক অর্থ বাহির করা সম্ভব হইত। "ক"-বাবু আগে কখনও অবাধ-ভাবানুষঙ্গ অভ্যাস করেন নাই। কাজেই প্রথম চেষ্টায় তাঁহার মনের গভীর প্রদেশের ভাব ধরা একরূপ অসম্ভব।

***স্বপ্ন**—"তে-তলার ষ্টুডিয়োর পশ্চিম দিক ভেঙ্গে পড়ে গেল।"

---

* স্বপ্নদ্রষ্টার কোন কথাই পরিবর্ত্তন করা উচিত নহে; এই কারণে তিনি যে যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আমি তাহাই রাখিলাম।

স্বপ্নটি খুবই ছোট ; কাজেই বিশ্লেষণের পক্ষেও সুবিধাজনক। স্বপ্নের এই অংশটুকুই Manifest Content—ব্যক্ত অংশ।

"ক"-বাবুকে নিশ্চেষ্টভাবে শুইয়া, মন হইতে অন্য সব চিন্তা দূর করিয়া, কেবল স্বপ্নের দিকেই মন দিতে বলিলাম। তাঁহাকে আরও জানাইলাম, স্বপ্নের এক এক অংশ আমি তাঁহাকে শুনাইব ; আমার কথায় তাঁহার মনে যে যে ভাবের উদয় হইবে, তাহা যেন তিনি নির্ব্বিচারে বলিয়া যান। আমি তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া সব কথা লিখিয়া লইলাম।

স্বপ্নটি আমি এই কয় ভাগে বিভক্ত করিয়া লইলাম—

(১) তে-তলা
(২) ষ্টুডিয়ো
(৩) পশ্চিম দিক
(৪) ভেঙ্গে পড়ে গেল।

এক একটি অংশ তাঁহাকে শুনানো হইলে তিনি যাহা-যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই—

(১) **তে-তলা**—আমার বাড়ী ; ম-বাবুর তিন-তলা বাড়ী ; ফ-র বাড়ী ; মুরারিপুকুর ; দেশের বাড়ী ;

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি; হাইকোর্ট; এস্‌প্লানেড; জল খাওয়া হয় নাই।

(২) **ষ্টুডিয়ো**—স্কাইলাইট; বড়দাদার ছেলে; বড়দাদার স্ত্রী; টেবিল; কেমেরা; টালির ছাদ; সিঁড়ি; ঘোরানো-সিঁড়ি; বাবা; নদী; চরণ; বিনোদ দালাল; পূর্ণবাবু।

(৩) **পশ্চিম দিক**—ষ্টুডিয়ো; বাইরের দেওয়াল; কার্নিশ; ষ্টুডিয়োর পাশে রান্নার জায়গা; উত্তর দিকে ভাঙ্গা অর্দ্ধেক-তৈয়ারী বাড়ী; ক্রিশ্চানদের গোরস্থান; ডাক্তার ঘোষ; সারকুলার রোড; জে, সি, বোসের বাড়ী।

(৪) **ভেঙ্গে পড়ে গেল**—গোরস্থান বাড়ীর সামনে; ভাঙ্গা কবর; ছেলেগুলা খেলছে; ছাদের ওপর খোলা জায়গা; ফ-র বাড়ীর পাশে; বাবা দেশের বাড়ীতে।

সমস্ত স্বপ্ন—"তে-তলার ষ্টুডিয়োর পশ্চিম দিক ভেঙ্গে পড়ে গেল।"—দেখছি যেন পড়ে গেছে। নীচের ঘরে বাবা আছেন—ঠিক নীচের ঘরে; পার্টিসান্‌ বারান্দা ভেঙ্গে গেছে; উই-য়ে খেয়ে ফেলেছে; চৌবে নীচে বসে আছে; মাসীমার অসুখ; দিদিমার ঘর খালি; "ফ"; ঢাকা; ওয়ারি; ধূলা; রাস্তা।

অবাধ-ভাবানুষঙ্গের সাহায্যে এই ভাবগুলি পাইলাম বটে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ইহা হইতে স্বপ্নের অর্থ বুঝার কোন সুবিধা হইল না। পাঠক কিন্তু পরে দেখিবেন, এই-সকল চিন্তাধারা প্রথম দৃষ্টিতে অসম্বদ্ধ ঠেকিলেও তাহার সমস্তটারই অর্থ আছে।

"ক"-বাবুকে চোখ খুলিতে বলিয়া যে ভাবগুলির সন্ধান পাইয়াছি, তাহার কতকগুলি লইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলাম। এই প্রশ্নের ফলে এইরূপ জানা গেল—

(১) **আমার বাড়ী**—বাবা বলিতেছেন, বাড়ী ভাড়া দিয়া দেশে চলিয়া এস। আমার যাইতে ইচ্ছা নাই। এই লইয়া বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য হইয়াছে।

ম-বাবুর তে-তলা বাড়ী—ইহাতে কারখানা হওয়ায় পাড়ায় একটা জঞ্জাল-বিশেষ হইয়াছে। আমাদের ঘর-দুয়ার, কাপড়-চোপড় ধোঁয়ায় ময়লা হয়। ম-বাবুকে বলিয়াও কোন প্রতীকার হয় না।

ফ-র বাড়ী—তুমি ত জান, এই বাড়ী আমি তৈরী করি; আর এই ব্যাপারে ফ-র সহিত পয়সা-কড়ি লইয়া আমার মনোমালিন্য ঘটে। আমাদের মধ্যে এখন এক রকম কথা বন্ধ।

মুরারিপুকুর—এখানে 'বোমা' হইয়াছিল। সে বাগান আমি দেখিয়াছি। ইহার নিকটে একটা জমি বায়না করিবার চেষ্টা করিতেছি। বেচিতে পারিলে কিছু লাভ হইবে।

দেশের বাড়ী—এর আর কি বলিব ?

জল খাওয়া হইল না—আজ সারা দুপুর বেলা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ও হাইকোর্টে কাটিয়াছে। সারা দিন কিছুই খাওয়া হয় নাই, বড়ই কষ্ট হইয়াছে।

(২) **ষ্টুডিয়ো, স্কাইলাইট**—ঠিক অবস্থায় নাই। মেরামত করিতে হইবে।

বড়দাদার ছেলে—দুষ্টামি করিয়া টেবিল ফেলে জিনিষ ভাঙ্গিয়াছে।

বড়দাদার স্ত্রী—বাবার ও বাড়ীর আর সকলের অমতে বড়দাদা বিবাহ করিয়াছেন।

কেমেরা—বিক্রয় করিতে চাই।

টালির ছাদ—কিছু মনে পড়ে না।

সিঁড়ি, ঘোরানো-সিঁড়ি, বাবা—উঠিতে বড় কষ্ট ; বাবা পড়িয়া না যান।

চরণ, বিনোদ দালাল, পূর্ণবাবু—জমির বায়না লইয়া বড়ই গোল বাধিয়াছে।

(৩) **ষ্টুডিয়ো, বাইরের দেওয়াল**—মেরামত করা দরকার।

ষ্টুডিয়ো; পাশে রান্নার জায়গা, উত্তর দিকে ভাঙ্গা অর্দ্ধেক-তৈয়ারী বাড়ী, ক্রিশ্চানদের গোরস্থান, ডাক্তার ঘোষ ইত্যাদি—কিছুই মনে পড়ে না।

(৪) **ভেঙ্গে পড়ে গেল**—বাবা ঠিক নীচের ঘরেই থাকেন; ষ্টুডিয়ো ভাঙ্গলে তিনিই চাপা পড়বেন।

গোরস্থান; বাড়ীর সামনে ভাঙ্গা কবর—বিশেষ কিছু মনে পড়ে না।

উপরে যতগুলি ভাব পাওয়া গেল, তাহার সমস্তটাই স্বপ্নের Latent Content বা অব্যক্ত অংশ। পাঠক বোধ হয় এখনও স্বপ্নের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টার মনের যে ইচ্ছা এই স্বপ্নে ফুটিয়াছে, তাহা অনেকেরই মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তাহার অর্থ সহজেই ধরা পড়িবে। পাঠক অবাধ-ভাবানুষঙ্গে (১) চিহ্নিত অংশ পুনরায় পাঠ করিলে দেখিবেন, তাহার সমস্তটার মধ্যেই একটা ঝগড়া, গোলমাল ও কষ্টের ভাব বর্ত্তমান। বাপের সঙ্গে গোলমাল; ফ-বাবু, ম-বাবু, ইত্যাদির সহিত

গোলমাল; হাইকোর্ট ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে কষ্ট, ইত্যাদি।

২য় অংশে বিরোধের আভাস। দাদার সহিত বাবার বিবাদ; দালালের সহিত মতভেদ, ইত্যাদি। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এই অংশে বাবার সিঁড়ি হইতে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কার কথা আছে।

৩য় অংশে ভাঙ্গা দেওয়াল, ভাঙ্গা বাড়ী ও কবরের কথা। ইহাতে একটা মৃত্যুর ইঙ্গিত রহিয়াছে।

৪র্থ অংশে "ক"-বাবুর চিন্তাধারা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। "বাবা ঠিক নীচের ঘরেই থাকেন, ষ্টুডিয়ো ভাঙ্গলে তিনিই চাপা পড়বেন।" ইহার পরেই পুনরায় "কবরের" কথা। এই চিন্তাধারার মধ্যে বাপের মৃত্যুর আভাস বর্ত্তমান।

প্রথম অংশে বাপের সহিত কলহ, দ্বিতীয় অংশে দাদা বাবার বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়াছেন, তৃতীয় অংশে কবরের কথা, চতুর্থ অংশে বাবা চাপা পড়িবেন এবং পুনরায় কবরের কথা।

ফ্রয়েডের মতে আমাদের প্রত্যেকের মনে অনেক অসামাজিক ও অন্যায় ইচ্ছা আছে। এই-সকল ইচ্ছা রুদ্ধ অবস্থায় থাকায় সহজে প্রকাশিত হয় না। আমরা

তাহাদের অস্তিত্বও জ্ঞাত নহি। এই রুদ্ধ ইচ্ছাগুলিই স্বপ্নে কাল্পনিক পরিতৃপ্তিলাভের চেষ্টা করে। বাপের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার ইচ্ছাও যেমন আমাদের সকলের মধ্যে আছে, সেই সঙ্গে আবার বাপের উপর একটা বিরুদ্ধভাবও আমাদের মনের মধ্যে থাকে। বড়লোকের মধ্যে 'বাপ মরুক' এই ভাবটা অনেক সময় ফুটিয়া বাহির হয়। পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন-লাভের দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল নহে। জানোয়ারদের মধ্যেও বাপ-বেটায় ঝগড়া স্বাভাবিক। আদিম যুগ হইতে মানুষমাত্রেরই মধ্যে এই বিরোধের ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; কেবল সুবিধা-সুযোগ পাইলেই তাহা আত্মপ্রকাশে সচেষ্ট হয়। এই বিরোধ-ভাবটা মনের মধ্যে রুদ্ধ থাকায়, তাহার অস্তিত্ব আমরা সহজে ধরিতে পারি না; শুধু তাই নয়, কেহ ধরাইয়া দিলেও সহজে মানিতে চাই না। কিন্তু ইহার অস্তিত্বের পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া কঠিন নহে। বাপের প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা সত্বেও মনের অজ্ঞাতে তাঁহার প্রতি বৈরীভাব থাকা যে বিচিত্র নহে, "ক"-বাবুর স্বপ্নে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। স্বপ্নে তিনি পিতার মৃত্যু-কামনা করিতেছেন। এরূপ সোজা স্বপ্নের যে এমন

বাঁকা অর্থ হইতে পারে, তাহা কেহই চট করিয়া বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। কিন্তু বিভিন্ন স্বপ্ন হইতে এরূপ চিন্তাধারার অস্তিত্ব বারবার বাহির করিতে পারিলে, স্বপ্নের ঐরূপ অর্থ অস্বীকার করিবার যো থাকে না। "ক"-বাবুও স্বপ্নের অর্থ শুনিয়া ঘোর আপত্তি করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—"ইহা গাঁজাখুরি, বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য।" তিনি আবার না কি বাপের মৃত্যু কামনা করিতে পারেন! আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম, জ্ঞাতসারে এইরূপ ইচ্ছা তাঁহার মনে উঠিতেছে না, অজ্ঞাতসারেই উঠিতেছে। "ক"-বাবু খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য! আমার এখন বেশ মনে পড়িতেছে, আমি আগে একবার বাবার মৃত্যুস্বপ্ন দেখিয়াছি।" আমি তাঁহাকে আরও স্মরণ করাইয়া দিলাম, স্বপ্নের কথা উঠিতেই তিনি প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন দেখি কেন, তাহার কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এই প্রশ্নের পরই ষ্টুডিয়োর স্বপ্নের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। ভাবিয়া দেখিলে পাঠক বুঝিবেন, অবাধ-ভাবানুষঙ্গ-ক্রমে যে-সকল ভাব আগে একেবারেই অসংলগ্ন ঠেকিতেছিল, তাহার সবগুলি একই চিন্তার দ্বারা

চালিত। পাঠক আপত্তি করিতে পারেন, এইরূপ মিল আকস্মিক। কিন্তু তিনি গুটিকয়েক স্বপ্ন এই উপায়ে বিশ্লেষণ করিলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এইরূপ আশ্চর্য্য মিলের সন্ধান পাইয়া, স্বপ্নের অর্থকে আর গাঁজাখুরি বলিতে ভরসা করিবেন না। আমাদের মনের মধ্যে যে-সব বৃত্তি রুদ্ধ আছে, সেগুলির সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকিলে তবে স্বপ্ন-বিশ্লেষণের সুবিধা হয়। সুপ্ত চিন্তার আভাস না পাইলে স্বপ্নের অর্থ বাহির করা দুরূহ।

প্রসঙ্গ কিছু অবান্তর হইলেও অবাধ-ভাবানুষঙ্গ-ক্রম সম্বন্ধে আমি আরও কিছু বলিতে চাই। মনের অনেক অজ্ঞাত ভাব যে এই উপায়ে জানা যাইতে পারে, এ কথা প্রথমে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু যে-কেহ পরীক্ষা করিয়া, ইহার সত্যাসত্য যাচাই করিতে পারেন। কোন বিষয় ভুলিয়া গেলে, বা কোন বিশেষ ঘটনা মনে করিতে না পারিলে, অবাধ-ভাবানুষঙ্গের সাহায্যে সময়ে-সময়ে তাহা বাহির করা যাইতে পারে; তাহার ফলে এই সাধন সম্বন্ধেও সন্দেহ থাকে না। অবাধ চিন্তায় যে-সকল ভাব পর-পর মনে উদিত হয়, আপাতদৃষ্টিতে

সেগুলি বিচ্ছিন্ন বোধ হইলেও, মনে রাখিতে হইবে, সঙ্গত কারণ ভিন্ন উহা মনে আসে নাই। একটি উদাহরণ দিতেছি। বোলপুরে একবার স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার একটি চাকর ছিল। নামটা তাহার অদ্ভুত। অদ্ভুত ঠেকিলেও খানিকক্ষণ পরেই আমি তাহা ভুলিয়া যাই। রাত্রে কথাপ্রসঙ্গে চাকরটির কথা উঠিলে, কিছুতেই তাহার নাম মনে আসিল না। আমি অবাধ চিন্তার সাহায্যে নামটা বাহির করিব সাব্যস্ত করিলাম। মনকে নিষ্ক্রিয় করিয়া, যাহা কিছু মনে আসিতে লাগিল, লিখিয়া লইলাম। প্রথমে মনে পড়িল--'বশিষ্ঠ', তাহার পর 'ইন্দ্রজিৎ'। এই দুইটা নাম মনে আসিলেও বুঝিলাম, দুইটার একটাও ঠিক নাম নহে। তবুও কথা দুইটি লিখিয়া রাখিলাম। তাহার পর মনে আসিল—'যোগেশ্বরী'। কেন যে এরূপ অদ্ভুত কথা মনে উদিত হইতেছে বুঝিতে না পারিলেও, এই-সব নাম বারবার মনে আসিতে লাগিল। এত করিয়াও চাকরের নাম স্মরণ করিতে না পারায়; বিরক্ত হইয়া চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। ঠিক করিলাম, কাল নামটা জিজ্ঞাসা করিয়া লইব।

পরদিন সকাল-বেলা নামটা শুনিবামাত্রই মনে হইল, হাঁ, মুনীশ্বরই বটে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, প্রথমেই আমার মনে পড়িয়াছে 'বশিষ্ঠ'—মুনিদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ মুনি। মুনীশ্বরের 'নী'-এর আভাস ইন্দ্রজিতের 'ইন'-এ আছে; কেবল উল্‌টাইয়া গিয়াছে মাত্র। তারপর 'মুনীশ্বরের' 'ঈশ্বর' 'যোগেশ্বরীতে' আসিয়া পড়িয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে-সব চিন্তা প্রথমে অসম্বদ্ধ মনে ঠেকিয়াছিল, তাহার মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা আছে। পাঠক ইহাকে আকস্মিক মনে করিতে পারেন; কিন্তু যদি বারবার এরূপ ঘটিতে দেখা যায়, আর বহু লোকেরও যদি এরূপ ঘটে, তাহা হইলে কথাটা আর হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না; এই ভাবের অর্থ বাহির করাকে কষ্টকল্পনা বলা চলে না। এই কারণেই স্বপ্নের অর্থ বাহির করিতে হইলে অবাধ-ভাবানুষঙ্গের আবশ্যকতা।

কখনও কখনও দেখা যায়, অবাধ-ভাবানুষঙ্গে চিন্তার ধারা থামিতে চায় না। সেক্ষেত্রে জোর করিয়া চিন্তা থামাইয়া দিতে হয়। কিন্তু কি অবস্থায় থামাইতে হইবে, তাহা অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। সাধারণতঃ, যখনই পরীক্ষাধীন ব্যক্তির চিন্তা বাহিরের বিষয়ের

দিকে চালিত হয়, তখনই বন্ধ করা উচিত। আমার এক বন্ধুকে 'কুকুর' কথাটি শুনাইলাম। তাঁহাকে অবাধ ভাবপ্রবাহে মনকে ছাড়িয়া দিতে বলিলাম। নিম্নে তাঁহার চিন্তা-ধারার নমুনা দিতেছি—

"ব্যাঙ খায়, নেমন্তন্ন যায়, গঙ্গার ঘাটে, সূর্য্যগ্রহণ, খুব ভিড় হয়েছে, গাড়ী গিয়েছিল, ঠাকুরের কাছে ভিড় হয়েছিল, আপিস সাইকেল করে আসছে, সুকিয়া ষ্ট্রীট, এমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়, ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা, অনেক গাড়ীর আড্ডা, জল জমেছে রাস্তায়, 'বরফ বিক্রী', আলোটা মিট্‌মিটে, সাপে ব্যাঙ খায়, কাবাব রুটি, জুতার দোকান, জুতা কিনতে হবে।"

উপরিলিখিত, 'বরফ বিক্রী' কথাটি মনে পড়িবার কারণ—সেই সময় রাস্তা দিয়া কুল্‌পি-বরফ হাঁকিয়া যাইতেছিল। চোখ বন্ধ, কাজেই ঘরের আলো পরীক্ষাধীন ব্যক্তির কাছে ম্লান বোধ হওয়ায় তিনি সেইরূপই বলিয়াছিলেন। এই পরীক্ষার একটু আগেই আমার আর-এক বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, বারান্দায় ব্যাঙ আসিয়াছে। আমরা দেখিতেছি, 'বরফ' কথার পর হইতেই পরীক্ষাধীন ব্যক্তির চিন্তা-ধারা আশপাশের জিনিষ ও সেই সময়কার প্রত্যক্ষের দিকে

গিয়াছে। সুতরাং এইখানেই ভাব-প্রবাহ থামানো উচিত। অধিকাংশ স্থলে পরীক্ষাধীন ব্যক্তি নিজেই চুপ করেন; বলেন, আর কিছুই তাঁহার মনে আসিতেছে না। অভিজ্ঞ ব্যক্তি অবাধ-ভাবানুষঙ্গের সময় অবান্তর বিষয় আসিলেই তাহা ধরিতে পারেন। এখানে পরীক্ষাধীন ব্যক্তির প্রথম চিন্তাই 'ব্যাঙ খায়'—এই পরীক্ষার পূর্ব্বেই ব্যাঙের কথা হইতেছিল; দেখা যাইতেছে তিনি তাহা তখনও ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার মন তখনও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয় নাই। পরীক্ষাধীন ব্যক্তির এই প্রথম অবাধ-ভাবানুষঙ্গের চেষ্টা। তিনি খবরের কাগজে একটু আগেই সূর্য্যগ্রহণ ও বন্যার কথা পড়িতেছিলেন, এই-সকল চিন্তাই মনে উঠিয়াছে। অবাধ-ভাবানুষঙ্গ হিসাবে এই পরীক্ষাটির মূল্য অল্প, কারণ দেখা যাইতেছে পরীক্ষাধীন ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হন নাই। দিনকতক অভ্যাসের পর এই উপায়ে মনের অন্তঃস্থলের অনেক সুপ্ত চিন্তা-ধারারই সন্ধান পাওয়া যায়। নূতন ব্রতীর প্রথম অবাধ-চিন্তায় বিশেষ ফললাভ নাও হইতে পারে।

এইবার "ক"-বাবুর স্বপ্নে পুনরায় ফিরিয়া আসিব। আমরা তাঁহার স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম, তিনি

পিতার মৃত্যু-কামনা করিতেছেন। অন্যান্য স্বপ্ন-বিশ্লেষণেও দেখা যায়, স্বপ্নে একটা-না-একটা রুদ্ধ ইচ্ছা চরিতার্থ হওয়ার চেষ্টা আছে। অবশ্য এ পরিতৃপ্তি কাল্পনিক। ফ্রয়েড বলেন, সকল স্বপ্নেই কোন-না-কোন ইচ্ছার কাল্পনিক পরিতৃপ্তি-সাধন দেখিতে পাওয়া যায়। স্বপ্নের আলম্বন কি, এতক্ষণে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইলাম। তৃষাতুর জল খাওয়ার স্বপ্ন দেখে, অজীর্ণরোগী দেখে—ভোজ খাওয়ার স্বপ্ন। ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া আমরা সময়ে-সময়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখি। সব সময় কিন্তু সোজাসুজি এই-সকল রুদ্ধ ইচ্ছার কাল্পনিক তৃপ্তি হয় না। "ক"-বাবু যদিও একবার পিতার মৃত্যু-স্বপ্ন সোজাসুজি দেখিয়াছেন, তথাপি আমাদের আলোচ্য উদাহরণে সেই ইচ্ছা বিকৃতভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিকৃতি কেন হয়, কিরূপে হয়—ফ্রয়েড তাহারও আলোচনা করিয়াছেন। সে কথা পরে বলিব।

জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ইচ্ছা

রুদ্ধ ইচ্ছাই যে স্বপ্নে কাল্পনিক পরিতৃপ্তিলাভের চেষ্টা করে, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই রুদ্ধ ইচ্ছা কি, আর তাহার উৎপত্তিই বা কিরূপে হয়, এবার তাহারই আলোচনা করিব। আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যগুলি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাহার বেশীর ভাগই আমাদের ইচ্ছাকৃত। এই-সকল কার্য্যে আমাদের ইচ্ছার অস্তিত্ব পরিস্ফুট আকারে বর্ত্তমান। যেমন, ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় ভাত খাইতে ইচ্ছা হইল, খাইবার জন্য আসনেও বসিলাম। এই রকম কাজ ছাড়া আমরা এমন আরও অনেক কাজ করি, যাহাতে আমাদের ইচ্ছার অস্তিত্ব স্পষ্ট ধরিতে পারা যায় না। পায়ে মশা বসিল, অন্যমনস্কভাবে হাত দিয়া তাড়াইয়া দিলাম। ইহা যে ঠিক ইচ্ছার বশেই করিয়াছি, এ কথা বলা চলে না। চোখে ধূলা পড়িল, চোখ বুজিলাম। এই চোখ-বোজা আমার ইচ্ছাধীন নহে। ধূলা পড়ায় আমার ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়াই চোখ আপনা হইতেই বুজিয়া যায়। অন্যমনস্ক-অবস্থায় আমরা যে-সব কাজ করি, তাহাতেও ইচ্ছা

পরিস্ফুট থাকে না। সাধারণের ধারণা, সকল কাজেই আগে আমাদের ইচ্ছা জন্মে, পরে সেই ইচ্ছার ফলে কাজ হয়। কথাটা সত্য হইলেও, অনেক স্থলে ইচ্ছা ও তদনুরূপ কার্য্যের পৌর্ব্বাপর্য্য ভাল রকম বুঝা যায় না। ইচ্ছার ফলেই যে কাজটি ঘটিয়াছে, ইহা বুঝিতে হইলে আগে মনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার। আমাকে কেহ গালি দিল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাকে এক চড় মারিলাম। এই চড়-মারা আমার ইচ্ছাকৃত বটে, কিন্তু মারিবার সময় আমার মনে যে সে ইচ্ছার উদয় হইয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। এইরূপ চড়-মারা, মশা-তাড়ানো, অন্যমনস্কভাবে কাজ করা প্রভৃতিতে ইচ্ছার অস্তিত্ব বুঝিতে হইলে মানসিক বিশ্লেষণের আশ্রয় লইতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইচ্ছার অনেক প্রকার-ভেদ আছে। যথা—

(১) যে-সকল ইচ্ছা একেবারে পরিস্ফুট, অস্তিত্ব বুঝিতে কষ্ট পাইতে হয় না। ধরুন, ইডেন গার্ডেনে যাই, কি পরেশনাথে বেড়াইতে যাই, এই লইয়া গোলে পড়িয়াছি; শেষে ঠিক হইল পরেশনাথেই যাইব। এক্ষেত্রে পরেশনাথে যাইবার ইচ্ছা পরিস্ফুটভাবে মনের মধ্যে উদিত হইল।

(২) যে-সব ইচ্ছা মনে স্পষ্ট না থাকিলেও তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান নহি। যেমন, প্রতিদিনের নিয়ম-মত সকালে উঠিয়া মুখ ধুইলাম। এরূপ স্থলে ইচ্ছা হইয়াছিল বলিয়াই যে মুখ ধুইয়াছি, তাহা মনে থাকে না। কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই সে কথা বুঝিতে পারি। সকল রকম অভ্যস্ত কাজেই এইরূপ ইচ্ছার অস্তিত্ব বর্ত্তমান। প্রথম পর্য্যায়ের ইচ্ছা জ্ঞানের কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত বলিলে এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ইচ্ছাকে জ্ঞানের প্রান্তে অবস্থিত বলিতে পারি।

(৩) যে-সকল ইচ্ছা অপরিস্ফুট, অথচ সহজেই তাহাদের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। যেমন, রাগের মাথায় চড়-মারা। এই ইচ্ছা যে জ্ঞানের একেবারে বাহিরে, তাহা বলা যায় না। এইরূপ ইচ্ছার অস্তিত্ব বুঝিতে হইলে মনকে কতকটা বিশ্লেষণ করা দরকার।

(৪) যে-সকল ইচ্ছার অস্তিত্ব কেবল অনুমান-সাপেক্ষ। মনকে বিশ্লেষণ করিয়াও এই শ্রেণীর ইচ্ছার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। কেবল কাজ দেখিয়া, বা পূর্ব্বে ঐরূপ ইচ্ছা মনে উদিত হইয়াছে জানিয়া, তাহার অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লইতে হয়। যেমন,

পানের উপর আমার খুব লোভ, অথচ ঠিক করিলাম আজ আর পান খাইব না। আমি একমনে বই পড়িতেছি, পাশেই পান-ভরা ডিবা। পড়িতে পড়িতে কখন যে অন্যমনস্কভাবে ডিবা হইতে পান মুখে পূরিয়াছি, জানিতে পারি নাই। খেয়াল হইলে দেখিলাম পান চিবাইতেছি। এক্ষেত্রে পান লওয়া আমার ইচ্ছাকৃত হইলেও, সে ইচ্ছার অস্তিত্ব আমি বুঝিতে পারি নাই। কখন যে মনে ঐ ইচ্ছা উঠিয়াছিল, চেষ্টা করিয়া তাহা ধরিবার উপায় নাই। তবে কার্য্য দেখিলে সন্দেহ থাকে না যে, পান খাইবার ইচ্ছা ছিল।

লক্ষ্য করিতে হইবে, এই ইচ্ছা অনুমানসাপেক্ষ হইলেও ইহার অস্তিত্ব অথবা সত্যতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। আরও লক্ষ্য করা দরকার, এইরূপ ইচ্ছা অপরিস্ফুট হইলেও পরিস্ফুট ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদিগকে কাজ করাইতে পারে। পান খাইব না, মনস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু পান খাইবার ইচ্ছা আমাকে অন্যমনস্ক পাইয়া চরিতার্থতা লাভ করিল।

(৫) যে-সকল ইচ্ছার অস্তিত্ব অনুমানসাপেক্ষ, কিন্তু বিশ্লেষণে তাহাদের প্রকৃতি ধরিতে পারিলেও মনে

যে ঐরূপ ইচ্ছা আছে, তাহা এত অসম্ভব মনে হয় যে, বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। ধরুন, আমি ব্যবসাদার। পাওনাদার টাকার বিল পাঠাইয়াছে। সৎ বলিয়া আমার অভিমান আছে। অথচ রোজই পাওনাদারের পাওনার টাকা পাঠাইতে আমার ভুল হয়। এস্থলে টাকা দিবার ইচ্ছা আমার নাই, এরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। আমার পাওনাদার এই রকমই ভাবিয়া থাকেন, বলেন দিবার ইচ্ছা থাকিলে দিতাম; তাই আমাকে গালি দিতে কসুর করেন না। আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম, কাজের ঝঞ্ঝাটে ভুল হইয়া গিয়াছে। তিনি তখনই চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন, আমার নিজের পাওনা টাকা আদায়ের চেষ্টা করিতে ত ভুলি না। সুতরাং কাজের ঝঞ্ঝাটে ভুল হওয়াটা একটা অজুহাতমাত্র। অজ্ঞাতসারে আমার মনের মধ্যে টাকা দিবার ইচ্ছা না থাকায় যে এইরূপ ঘটিয়াছে, এ কথা মানিয়া লইতে অনেকেরই আপত্তি হইবে;—বিশেষতঃ দেনদারদিগের। এখানে একটা বড় কথা উঠিতেছে। এইরূপ অনুমান করা যুক্তিযুক্ত কি না? কেবল একটি ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া যদি এইরূপ অনুমান করিতে হয়, তবে তাহা ঠিক

নাও হইতে পারে; কিন্তু যদি দেখা যায় বারবার আমার টাকা দিতে ভুল হইতেছে, আর টাকা না দিবার ইচ্ছা আমার অন্যান্য ব্যবহারেও প্রকাশ পাইতেছে, তখন টাকা না দিবার ইচ্ছাই যে মনের মধ্যে রহিয়াছে, এরূপ অনুমান অন্যায় হইবে না। কি ধরণের প্রমাণ পাইলে এইরূপ ইচ্ছার অস্তিত্ব মানিব, সে কথা এখানে আলোচনা করিব না। এই প্রকার ইচ্ছা আমাদের শুধু অজ্ঞাত নয়, কেহ তাহার অস্তিত্ব দেখাইয়া দিলেও আমরা সহজে মানিতে চাই না। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এরূপ ইচ্ছার বশে আমরা যে-সব কাজ করি, সে-সবের অন্য কারণ দেখাইয়া থাকি। যেমন, কাজের ঝঞ্ঝাটে ভুল হইয়াছে। এরূপ কারণ-দেখানো এত স্বাভাবিক যে, মনোবিদেরা ইহার এক নূতন নাম রাখিয়াছেন—Rationalization; বাঙ্গালায় যুক্ত্যাভাস বলা যাইতে পারে। এই যুক্ত্যাভাস হঠাৎ শুনিতে ন্যায়সঙ্গত যুক্তিরই মত, কিন্তু বিচারে টেকে না। যেমন, বিলের টাকা না দেওয়ার কারণ বলিতেছি—কাজের ঝঞ্ঝাটে ভুল হইয়াছে। অথচ, নিজের পাওনা আদায়ের বেলা আমার আদৌ ভুল হয় না। তর্কে পরাস্ত হইলেও যুক্ত্যাভাস-প্রদর্শনকারী

বলিবেন, ভুল হইয়াছে, অন্যমনস্ক হইয়া করিয়াছি, এমন সকলেরই হয়, ইত্যাদি। পাঠক দেখিবেন, এই-সকল ভুল বা অন্যমনস্কতা একটা নিয়মের অধীন, আকস্মিক নহে।

(৬) আগেই যে ইচ্ছার কথা বলিলাম, তাহা জ্ঞানের বহির্ভূত হইলেও, অনুমান দ্বারা তাহার অস্তিত্ব নিরূপিত হইলে, সেই ইচ্ছা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কোন-না-কোন সময় এইরূপ ইচ্ছা আমাদের চেতনায় উঠিতে পারে। পরকে ঠকাইবার ইচ্ছা এমন-কিছু অদ্ভুত নহে যে, তাহা একেবারে আমাদের অস্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এখন আমরা যে ধরণের ইচ্ছা আলোচনা করিব, তাহা হঠাৎ শুনিতে অদ্ভুত ও অসম্ভব বোধ হইবে। বলা বাহুল্য, এরূপ ইচ্ছা আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত হওয়ায় কেবল অনুমানের সাহায্যে তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে হয়। ধরুন, যদি আমি বলি, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই মরিবার ইচ্ছা আছে, তাহা হইলে কথাটা সকলেই অসম্ভববোধে হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। আমরা ত সর্ব্বদাই 'প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত'; মরিতে যে চাই—এ কথা ত মন একেবারেই মানিতে চায় না। এইরূপ ইচ্ছার অস্তিত্ব কিরূপে

নির্ণীত হইতে পারে, উদাহরণ দিয়া বুঝাইব। মনে করুন, রামবাবু নানা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া সংসারে বীতস্পৃহ হইয়াছেন। তিনি আত্মহত্যা করিবার মানসে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। এ ক্ষেত্রে রামবাবুর যে মরিবার ইচ্ছা হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং এই ইচ্ছা প্রথম পর্য্যায়ের ইচ্ছার ন্যায় তাঁহার জ্ঞানের কেন্দ্রস্থলেই অবস্থিত। আমরা সকলেই বৃদ্ধ বয়সে মরিবার জন্য উৎসুক হইতে পারি, কিংবা দুঃখ-কষ্টের জ্বালায় যৌবনেও মৃত্যু-কামনা করিতে পারি। ইহা হইতে বুঝা যায়, মরিবার ইচ্ছা আমাদের সকলের মনের মধ্যেই সুপ্তভাবে রহিয়াছে; কেবল সুবিধা-সুযোগ পাইলেই তাহা আত্মপ্রকাশ করে মাত্র। যে ইচ্ছার অস্তিত্ব একেবারেই নাই, তাহা কখনও ফুটিতে পারে না। আমাদের সকলেরই প্লীহা আছে, সুস্থ অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব আমরা টের পাই না। কিন্তু যিনি ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছেন, তাঁহার পক্ষে প্লীহার অস্তিত্ব বুঝা খুবই সহজ। ম্যালেরিয়া নূতন করিয়া প্লীহা সৃষ্টি করে না,—যে প্লীহা আছে, তাহারই বৃদ্ধি-কল্পে সহায়তা করে মাত্র। সেইরূপ, দুঃখ-কষ্টে বা বার্দ্ধক্যে আমাদের মৃত্যু-ইচ্ছা প্রকটিত হয় মাত্র। আরও

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। হরিবাবু সাঁতার একেবারেই জানেন না। জলে পড়িলে 'পিলস্থজে'র মত ডুবিয়া যাইবেন, এ কথা তাঁহার বেশ জানা আছে। কালবৈশাখী ; আকাশ মেঘে ভরা ; তিনি একা নৌকায় চড়িলেন ; বলিলেন, গঙ্গাবক্ষে কিছু ফুর্ত্তি করিয়া আসা যাক। এমন সময় দমকা বাতাসে নৌকাডুবি হইয়া তিনি প্রাণ হারাইলেন। এস্থলে যদি বলা যায়, হরিবাবুর ভিতরে-ভিতরে মরিবার একটা ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। অবশ্য মরিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হয় নাই, এ কথা সত্য। মৃত্যুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও যখন আমরা কোন বিপদজনক কাজ করিতে যাই, তখন আমরা যে মৃত্যু-ইচ্ছার বশেই চলিতেছি, এ কথা বলিলে অন্যায় হয় না। অবশ্য এই মৃত্যু-ইচ্ছা মনের মধ্যে সুপ্ত থাকায় আমরা কৃত কার্য্যের আর পাঁচটা কারণ দেখাইয়া থাকি। এইরূপ যুক্ত্যাভাস পূর্ব্ব পর্য্যায়ের ইচ্ছার বশে কৃত কার্য্যেও দেখা গিয়াছে। কবি শেলীর মৃত্যু অনেকে আকস্মিক মনে করেন। আমার মতে ইহা একরূপ আত্মহত্যা। ঝড় আসন্ন জানিয়াও শেলী দুইজন আনাড়ী লোকের সহিত নৌকায় বাহির হইয়া

সমুদ্রে ডুবিয়া মরেন। যাঁহারা স্বেচ্ছায় লড়ায়ে যান, তাঁহাদের মধ্যেও এইরূপ মরিবার ইচ্ছা বর্ত্তমান। এই মৃত্যু-ইচ্ছার প্রেরণা সকল ক্ষেত্রে সমান নহে। যিনি জানিয়া-শুনিয়া আত্মহত্যা করিতে যাইতেছেন (যেমন রামবাবু) তাঁহার মরিবার ইচ্ছা অপেক্ষা হরিবাবু—যিনি সাঁতার না জানিয়া ঝড়ের মধ্যে নৌকা চড়িয়াছেন—তাঁহার মরিবার ইচ্ছার প্রেরণা অপেক্ষাকৃত কম। যাঁহারা লড়ায়ে যান, তাঁহাদের মৃত্যু-ইচ্ছা আরও অপ্রকাশ বলিতে পারি। যাঁহারা গাড়ী-ঘোড়ার ভিড়ের মধ্যে যান, তাঁহাদেরও এইরূপ মরিবার ইচ্ছা আছে বলা চলে। আমরা দৈনন্দিন কার্য্যে কত না বিপদের মধ্যে যাইতেছি। অতএব প্রতিদিনই আমাদের মৃত্যু-ইচ্ছা নানা কার্য্যে প্রকাশ পাইতেছে। এই ইচ্ছার অস্তিত্ব কিন্তু শুধু যুক্তি ও অনুমানের বলেই নির্ণয় করিতে হয়। এইরূপ ইচ্ছার একটা লক্ষণ এই, আমাদের জ্ঞানে তাহা কখনও ইচ্ছা বলিয়া ত প্রকাশ পায়-ই না, বরং ভয়-রূপে দেখা দেয়। ভিতরে ইচ্ছা মরিবার, কিন্তু বাহিরে ভয়—পাছে মরি। ইচ্ছার ভয়-রূপে প্রকাশ আমরা অনেক সময়েই দেখিতে পাই। চোরের চুরি করিবার ইচ্ছা,—পাছে তাহা কাজে প্রকাশ

পাইয়া পাঁচজনের নজরে পড়ে, সেজন্য সে সর্ব্বদাই শঙ্কিত। অসৎ ইচ্ছাকে লুকাইতে গেলে আমাদের পদে-পদে ভয় হয়, বুঝি বা তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আগেকার উদাহরণে হরিবাবুর মৃত্যু-ইচ্ছার অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যাইলেও দেখা যাইতেছে তাঁহার জ্ঞানে বাঁচিবার ইচ্ছাটাই প্রবল। এক্ষেত্রে মনের মধ্যে বাঁচিবার ও মরিবার দুইটি বিরুদ্ধ ইচ্ছাই রহিয়াছে বলিতে হইবে। দুইটি বিরুদ্ধ ইচ্ছা কখনও একই সময়ে প্রকাশ পাইতে পারে না। এই কারণে সুপ্ত ইচ্ছা আত্মপ্রকাশে বাধা পাইলে ভয়-রূপে জ্ঞানে দেখা দেয়। পূর্ব্বকথিত স্বপ্নের উদাহরণে "ক"-বাবুকে যে পিতার মৃত্যু-কামনা করিতে দেখা গিয়াছিল, এখানে সে-সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। আমাদের মনের অগোচরে যেরূপ মৃত্যু-ইচ্ছা লুক্কায়িত আছে, "ক"-বাবুরও পিতার মৃত্যু-কামনা সেইরূপ মনের অজ্ঞাতে লুকানো ছিল। জ্ঞানে তিনি ইহার কোনও আভাস পান নাই। বরং আমি যখন তাঁহাকে এইরূপ ইচ্ছার অস্তিত্ব দেখাইয়া দিলাম, তখন তিনি তাহা সহজে স্বীকার করিতে চান নাই। বাপের মৃত্যু-কামনা ত দূরের কথা, পাছে বাপের মৃত্যু হয়—এই আশঙ্কাই তাঁহার জ্ঞানে প্রবল ছিল।

ইচ্ছা কেন অজ্ঞাত হয়

আমাদের মনের অগোচরে নানা অজানা ইচ্ছা থাকিতে পারে, যাহাদের বশে আমরা অনেক কাজ করিয়া থাকি। এই-সকল ইচ্ছা কেন যে জ্ঞানের বহির্ভূত, এবার তাহাই বলিব। মনোবিৎ পণ্ডিতেরা এ-সম্বন্ধে একমত নহেন, আর এই প্রশ্নের বিশদ আলোচনাও করেন নাই। আমি এখানে আমার নিজের মতই প্রকাশ করিব। আমি সাইকেল চড়িতে শিখিতেছি। যাহাতে পড়িয়া না যাই সেজন্য আমাকে সচেষ্ট থাকিতে হইতেছে, পদে-পদে যথেষ্ট ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করিতে হইতেছে। দিন-কতক অভ্যাসের পর পতন নিবারণের জন্য আমাকে আর চেষ্টাই করিতে হয় না। কাজটা আপনা-আপনি হইতে থাকে। সকল প্রকার অভ্যস্ত কাজের মজাই এই, ইহাতে ইচ্ছার অস্তিত্ব মোটেই টের পাওয়া যায় না। অভ্যস্ত হইবার পূর্ব্বে যে ইচ্ছা জ্ঞানে স্পষ্ট ছিল, অভ্যস্ত হইবার পর সে ইচ্ছার অস্তিত্ব ধরিতে পারা যায় না,—ধরিতে গেলে অনুমানের আশ্রয়

লইতে হয়। ইচ্ছা করিয়া কোন কাজ করিতে গেলেই তাহার সহিত একটা চেষ্টার সংশ্রব থাকে। আর বারবার এইরূপ চেষ্টায় মনে ক্লান্তি আসিতে পারে। অবশ্য কার্য্যে অভ্যস্ত হইয়া গেলে এরূপ চেষ্টার আর আবশ্যকতা থাকে না; সেজন্য অভ্যস্ত কাজে ক্লান্তিও কম হয়। অতএব দেখা গেল, ইচ্ছা জ্ঞানের বাহিরে গেলে একটা লাভ আছে। কাজের বাধা কমিবার সঙ্গে-সঙ্গে ইচ্ছাও জ্ঞানের বহির্ভূত হইয়া থাকে। সুতরাং বলা যায়, কার্য্যে বাধা থাকিলেই ইচ্ছা পরিস্ফুট হয়। যে কার্য্য বাধাহীন, সে কার্য্যে ইচ্ছার অস্তিত্ব অপ্রকাশ থাকে। অভ্যাসই বাধা দূর করে, সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাকে অপ্রকাশ করে। অনেক মনোবিদ্‌দের মতে আদিম জীবের প্রত্যেক কার্য্যই ইচ্ছা-সম্ভূত ছিল। ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে ইচ্ছার বহির্ভূত হইয়াছে। এরূপ দৈহিক কার্য্যেও একটা অজ্ঞাত ইচ্ছা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কোন কার্য্যে যদি বাধা বেশী থাকে, তবে সে কার্য্য করিবার চেষ্টাই সম্ভব হয় না। এরূপ স্থলেও ইচ্ছা দেখা দেয় না। একেবারে বাধাহীন কার্য্যে

ইচ্ছা যেমন অপ্রকাশ থাকে, বাধা অলঙ্ঘনীয় হইলেও সেইরূপ ইচ্ছা ফুটিতে পায় না। মনের মধ্যে যখন দুইটি বিরুদ্ধ ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে—যেমন মরিবার ও বাঁচিবার—তখন একটির পক্ষে অপর ইচ্ছাজনিত বাধা অলঙ্ঘনীয় হয়, আর তখন সে ইচ্ছাটি একেবারে জ্ঞানের বাহিরে চলিয়া যায়। ইহাই আমার মত। বাধা যেখানে লঙ্ঘনীয়, সেখানে চেতনার আবির্ভাব হয়। অন্যথা নহে।

উপরে ইচ্ছার কয়টি বিভাগ কল্পনা করা গিয়াছে। ইচ্ছাকে যে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহা কেবল বুঝাইবার সুবিধার জন্য। বস্তুতঃ, সংজ্ঞাত হইতে আরম্ভ করিয়া নির্জ্ঞাত ইচ্ছা পর্য্যন্ত অসংখ্য ভাগ কল্পনা করা যাইতে পারে। যে রকম ভাগই করি তাহা কাল্পনিক হইবে। ফ্রয়েড ইচ্ছার তিনটি বিভাগ করিয়াছেন, Conscious, Foreconscious এবং Unconscious। Conscious অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকারের অন্তর্গত, Foreconscious—যাহা চেষ্টার দ্বারা জ্ঞানে আনিতে পারা যায়, এবং Unconscious —যাহা জ্ঞানে আনিতে পারা যায় না।

আমি কিন্তু চারিটি বিভাগের পক্ষপাতী—

(১) Conscious—সংজ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

(২) Foreconscious—আসংজ্ঞাত অর্থাৎ চেষ্টার ফলে যেখানে জ্ঞানের অধিকার বিস্তার করা যায়।

(৩) Subconscious—অন্তর্জ্ঞাত অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকারের বহির্ভূত হইলেও কোন-না-কোন দিন যে ইচ্ছা মনে উঠা সম্ভব।

(৪) Unconscious—অজ্ঞাত বা নির্জ্ঞাত, অর্থাৎ যে ইচ্ছা কোনদিন মনে উঠিতে পারে না; যাহার অস্তিত্ব কেবলই অনুমানসাপেক্ষ।

স্বপ্নে উল্লিখিত সকল প্রকার ইচ্ছার অস্তিত্বই দেখা যায়। ফ্রয়েডের মতে, জ্ঞানের বহির্ভূত অর্থাৎ নির্জ্ঞাত ইচ্ছাই মূলতঃ স্বপ্নে কাল্পনিক পরিতৃপ্তিলাভের চেষ্টা করে এবং তাহা অন্যান্য পর্য্যায়ের ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত হওয়ার ফলে অন্য প্রকারের ইচ্ছাও স্বপ্নে দেখা যায়। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া স্বপ্ন দেখিলাম জল খাইতেছি। পাঠক মনে করিতে পারেন ইহাতে পরিস্ফুট বা সংজ্ঞাত ইচ্ছাই পরিতৃপ্ত হইল। কিন্তু ফ্রয়েডের মতে, বিশ্লেষণ করিলে এই ধরণের স্বপ্নের মধ্যেও কোন-না-কোন প্রকার অজ্ঞাত ইচ্ছার অস্তিত্ব দেখা যাইবে।

রুদ্ধ ইচ্ছার প্রকাশ

আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেও মনের মধ্যে যে নানাপ্রকার ইচ্ছা উঠিতে পারে, সে কথা আগেই বলিয়াছি। এই-সকল ইচ্ছার বশে আমরা অনেক রকম কাজ করি বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে তাহার ঠিক কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না ;—একটা মন-গড়া কারণ বা যুক্ত্যাভাস দিই মাত্র। এই ধরণের ইচ্ছা কেন যে জ্ঞানগোচর হয় না, তাহাও বলা হইয়াছে। মনের রুদ্ধ বা অবদমিত ইচ্ছা নানাপ্রকারে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। স্বপ্নতত্ত্ব-আলোচনায় ইহা প্রথমে অবান্তর ঠেকিতে পারে, কিন্তু মনের অবদমিত ইচ্ছাই স্বপ্নে কাল্পনিক পরিতৃপ্তিলাভ করে বলিয়া ইহার আলোচনা আবশ্যক।

অবদমিত ইচ্ছা বাধা পায় বলিয়াই জ্ঞানগত হয় না ; এইজন্য রুদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তি বুঝিতে হইলে, সংজ্ঞাত ইচ্ছা বাধা পাইলে কি হয়, তাহা আগে জানা দরকার। সংজ্ঞাত ইচ্ছা বাধা পাইলে যে-যে প্রকারে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করে, অবদমিত ইচ্ছাও আত্মপ্রকাশের জন্য প্রায়

সেই-সকল প্রকারেই ব্যক্ত হইয়া থাকে। অবশ্য প্রকাশ-কালে সংজ্ঞাত ইচ্ছার রূপান্তর ঘটিলে তাহার কারণ আমরা বুঝিতে পারি; যেমন, দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে হইলে কেন ঘোল খাইতেছি, তাহা কাহারও অজানা থাকে না। কিন্তু অজ্ঞাত ইচ্ছা যখন রূপান্তরিত হইয়া প্রকাশ পায়, তখন কাজ দেখিয়া হঠাৎ বোঝা যায় না যে, তাহা ঐরূপ ইচ্ছারই ফল। কেবল বিশ্লেষণের দ্বারাই এরূপ কার্য্যের যথার্থ কারণ নির্ণয় করা সম্ভব।

মনে করুন, আমি রোগী। চিকিৎসক আমাকে চিনি খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু চিনি আমার বড়ই মুখরোচক্। কাজেই এই নিষেধ আমায় মহা-গোলে ফেলিল। একদিকে চিনি খাইবার ইচ্ছা, অন্য-দিকে চিকিৎসকের নিষেধ। অন্য অবস্থায় আমি এরূপ নিষেধ মানিতাম কি না সন্দেহ। এখন কিন্তু না মানিলে রোগ বৃদ্ধি পাইয়া মৃত্যুর সম্ভাবনা। কাজেই বাধ্য হইয়া চিকিৎসকের নিষেধ মানিতে হইতেছে। পাঠক এখানে লক্ষ্য করিবেন, বাহিরের বাধা বা নিষেধ আমরা তখনই মানি, যখন আমাদের কোন ইচ্ছার সহিত তাহার মিল থাকে। এখানে বাঁচিবার ইচ্ছা মনে

রহিয়াছে, তাই চিকিৎসকের নিষেধ মানিতেছি। সেইরূপ, পাছে জেলে কষ্ট পাইতে হয়, আর তাহার ফলে আমার সুখের ব্যাঘাত জন্মে, তাই পুলিসের নিষেধ মানি। তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইল এই, মনের কোন ইচ্ছাকে বাধা দিতে বা নষ্ট করিতে হইলে দরকার —অপর একটি ইচ্ছা। বাহিরের কোন বাধাই আমার চিনি খাইবার ইচ্ছাকে নষ্ট করিতে পারে না; পারে কেবল আমার ইচ্ছার পূর্ণতালাভের পথে (যেমন আমার চিনি খাওয়াকে) বাধা দিতে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, সে বাধা আমার ইচ্ছার বাধা নহে —ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যের। চিনি খাইবার পয়সা না জুটিলে বা জোর করিয়া কেহ চিনি খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলে, আমার চিনি খাইবার ইচ্ছা নষ্ট হইবে না। উপরের উদাহরণে আমার চিনি খাইবার ইচ্ছাকে বাধা দিতেছে, রোগ হইতে পরিত্রাণলাভের ইচ্ছা। এরূপস্থলে আমার আচরণ কত রকমের হইতে পারে, তাহার একটু আভাস দিতেছি—

(১) ডাক্তারের নিষেধ-সত্ত্বেও চিনি খাইব। এখানে চিনি-খাওয়ার আপাতসুখের ইচ্ছা, আমার বাঁচিবার ইচ্ছাকে পরাস্ত করিয়াছে। দুইটি বিভিন্ন শক্তি

বিরোধী হইয়া যেমন পরস্পরকে বাধা দেয়, সেইরূপ দুইটি বিরুদ্ধ ইচ্ছাও পরস্পরকে বাধা দিতে বা একটি অপরটিকে পরাস্ত করিতে পারে।

(২) পাছে চিনি দেখিলে খাইতে ইচ্ছা হয়, তাই নিষেধ করিয়া দিলাম, 'খবরদার, চিনি যেন আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায় না আসে।' ইহা যেন কতকটা 'কাল বরণ রাধা আর হেরিবে না'র মত। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ভিতরে যাহা চাই, বিরুদ্ধ ইচ্ছার ফলে বাহিরে তাহাই প্রত্যাখ্যান করিতেছি।

(৩) বন্ধুর বাড়ী গিয়াছি। তিনি ছানা চিনি ফলমূল ইত্যাদি খাইতে দিলেন। তাঁহাকে বলিলাম, 'চিনি খাই না।' অথচ গল্প করিতে করিতে অন্যমনস্ক ভাবে চিনি খাইয়া ফেলিলাম।

(৪) চিনি খাইবার দারুণ ইচ্ছা, অথচ খাইবার উপায় নাই। মনে মনে ভারি রাগ হইল, অনর্থক হাত-পা ছুঁড়িয়া চাকর-বাকরকে বকিতে লাগিলাম।

(৫) চিনি খাইবার ইচ্ছা হইল। মনকে বুঝাইলাম —চিনি দুনিয়ার এমনই কি চিজ্ যে না খাইলে চলিবে না। চাকরকে বলিলাম, 'মুড়ি আন্'। একপেট মুড়িই খাইয়া বসিলাম।

(৬) চিনি খাইতে না পাওয়ায় স্যাকেরিন খাইয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইলাম, অথবা মিষ্ট ফলমূলের ভক্ত হইয়া পড়িলাম।

উপরের ছয় প্রকার দৃষ্টান্তে চিনি খাইবার ইচ্ছা কোন-না-কোন কার্য্যে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এইবার যে উদাহরণগুলি দিব, তাহাতে ইচ্ছার অভিব্যক্তি কাজে নয় কল্পনায়।

(৭) চিনি খাইবার ইচ্ছা হইল। মনে মনে কল্পনা করিলাম, খুব চিনি খাইতেছি। ইহা যেন আকাশ-কুসুমের কল্পনা, গরীবের পক্ষে কল্পনার রথে চড়িয়া বড়লোক হওয়া।

(৮) চিনি খাইবার ইচ্ছা যদি অন্যায় বলিয়া বুঝি, তবে মনে মনে চিনি খাইবার কল্পনাতেও ব্যাঘাত জন্মে। তখন ভাবিব, খুব মিষ্ট ফলমূল বা স্যাকেরিন খাইতেছি। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, যেখানে বাধা অধিক সেখানে নিষিদ্ধ ইচ্ছাকে সোজাসুজি কল্পনাতেও আনিতে পারা যায় না।

(৯) বাধা আরও বেশী হইলে কল্পনার সাহায্যে মিষ্ট দ্রব্য খাইতেও সাহস হইবে না। মুড়ি বা অন্য কিছু খাইব, মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া চিনি খাইবার ইচ্ছাকে ভুলিতে চেষ্টা করিব।

(১০) নিজে চিনি খাইতে পাই না। তাই আর-পাঁচজনকে চিনি খাওয়াইয়া মনে মনে যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি লাভ করিলাম। এক্ষেত্রে কল্পনাতেও নিজের চিনি খাইবার সাহস নাই। পরের চিনি-খাওয়ার তৃপ্তি দেখিয়া নিজের ইচ্ছার কাল্পনিক চরিতার্থতা লাভ করি মাত্র। যদি বলি, বিধবাদের পরকে মাছ খাওয়াইবার তৃপ্তি এই প্রকারের, তাহা হইলে অনেকেই হয় ত আমার উপর খড়গহস্ত হইবেন। শরৎবাবুর কোন উপন্যাসে এই কথাটির আভাস আছে। পরের সুখে নিজে সুখী হওয়ার অর্থই তাহার সহিত তাদাত্ম্য হওয়া (Identification).

(১১) চিনি খাইবার উপায় নাই। মনকে বুঝাইলাম, চিনি বড় মহার্ঘ—না খাওয়াই ভাল। নিকটের বাজারেও ভাল চিনি মেলে না; কেই বা কষ্ট করিয়া দূর হইতে আনে, ইত্যাদি। এখানে চিনি খাইবার স্বাভাবিক বাধাগুলি অতিরঞ্জিত আকারে দেখিতেছি।

(১২) চিনি খাইবার স্বাভাবিক বাধাগুলিই যে অতিরঞ্জিত আকারে দেখিতেছি তাহা নহে। পরন্তু চিনিতে পেট গরম করে, পেটে কৃমি হয়, ইত্যাদি

চিনির নানা দোষ বাহির করিতেছি। ইহা যেন 'কথামালার' শেয়ালের গল্পের 'আঙুর টক' কথাটার মত।

(১৩) চিনি বড় খারাপ জিনিষ। আমি ত খাই-ই না, চারু বড় চিনি ভালবাসে; ইহার ফল তাহাকে একদিন ভুগিতেই হইবে। তাহাকে দেখিলে মনে বড় কষ্ট হয়, বেচারা চিনি খাইয়া খাইয়া শরীরটা নষ্ট করিতেছে, ইত্যাদি। এখানে নিজের ইচ্ছা পরের ঘাড়ে চাপাইতেছি, আর সেটা যে খারাপ, ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। এইরূপ নিজের ইচ্ছা পরের ঘাড়ে চাপাইয়া, তাহার দোষ দেখিবার চেষ্টাকে প্রক্ষেপণ (Projection) বলা হয়।

(১৪) দেবতাকে চিনি দান করিলাম। যে জিনিষ দেবতাকে দিয়াছি, আর কি তাহা খাইতে পারি? এরূপ ইচ্ছা মনে আনাই পাপ, সুতরাং চিনি পরিত্যাজ্য।

(১৫) দেশের কত দীনদরিদ্র চিনি খাইতে পায় না। তাহারা চিনি খাইতে পাইবে না, আর আমি মজা করিয়া চিনি খাইব? এ যে ঘোর স্বার্থপরতা। অতএব চিনি খাইবার পাপ-ইচ্ছা আর মনেও স্থান দিব না, ইত্যাদি।

অপর এক ইচ্ছা আমার চিনি খাইবার ইচ্ছার অন্তরায় না হইলে, তাহা সোজাসুজি পরিতৃপ্তিলাভের চেষ্টা করিত। কিন্তু বাধা পাইলে, ইচ্ছা যে কত প্রকারে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে, উপরে তাহার কিছু কিছু আভাস দিলাম।

(১৬) পূর্ব্বে যতগুলি চেষ্টার বিবরণ দিয়াছি, তাহা আমাদের জাগ্রৎ অবস্থার। মনে রাখিতে হইবে, রুদ্ধ বা অবদমিত ইচ্ছা কেবল জাগ্রৎ অবস্থাতেই নয়, স্বপ্নেও নানা আকারে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। যে উদাহরণগুলি দিলাম তাহার সমস্তই স্বপ্নে দেখা সম্ভব। স্বপ্নে রুদ্ধ ইচ্ছা পূর্ব্বোক্ত নানা প্রকারে বিকৃত হইয়া প্রকাশ পায়। ইতিপূর্ব্বে "ক"-বাবুর যে স্বপ্নটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে তাঁহার পিতার মৃত্যু-কামনা বিকৃত অবস্থাতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

অজ্ঞাত ইচ্ছার প্রকাশ

এখন আমরা দেখিতেছি যে, জ্ঞানগত ইচ্ছা বাধা পাইলে নানা প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশের চেষ্টা করে। মনের অবদমিত ইচ্ছাগুলি সোজাসুজি চরিতার্থ হওয়ার সম্ভাবনা দূরে থাক, সংজ্ঞানে আসিবার পথেই বিস্তর বাধা। তাই এই-সকল অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছা পূর্ব্বোক্ত নানা প্রকারে মনের প্রহরীকে ফাঁকি দিয়া বিকৃত অবস্থায় প্রকাশ পায়। অবদমিত ইচ্ছাগুলির আত্মপ্রকাশে বাধা দেয়—তাহাদের বিরুদ্ধ ইচ্ছা; যেমন মরিবার ইচ্ছাকে সংবিতে আসিতে দেয় না—বাঁচিবার ইচ্ছা।

যখনই মরিবার ইচ্ছা আমাদের মনে ফুটিবার চেষ্টা করে, তখনই বাঁচিবার ইচ্ছা আসিয়া তাহাতে বাধা দেয়। এই বাধার ফলে মরণের ইচ্ছা সোজাসুজি মনে না উঠিয়া ভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। বিপদের মধ্যে যাইয়া বাহাদুরী লইবার ইচ্ছা—মৃত্যু-ইচ্ছারই রূপান্তরমাত্র। ইচ্ছার এইরূপ রূপান্তর দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি না যে, তাহা প্রকৃতপক্ষে মরণের ইচ্ছা,

সুতরাং তাহা মনে ফুটিতে বাধা পায় না। বাঁচিবার ইচ্ছাকে প্রহরীর সহিত তুলনা করিলে আমরা বলিতে পারি, এই প্রহরী আছে বলিয়াই মৃত্যু-ইচ্ছা সোজাসুজি প্রকাশ পাইতে পারে না। কিন্তু মৃত্যু-ইচ্ছা বিপদসঙ্কুল কাজে বাহাদুরী লইবার ইচ্ছা-রূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিলে প্রহরীকে সহজেই এড়াইয়া আসিতে পারে। এইরূপ আমাদের অনেক অন্যায় ইচ্ছাকে মনে ফুটিতে দেয় না—আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান, সামাজিক ব্যবহার প্রভৃতি। এরূপস্থলে এগুলি প্রহরীর কাজ করিয়া থাকে। ধরুন, আমার মনের মধ্যে কাহাকেও মারিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু পরকে মারা অন্যায়, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ও নিন্দনীয় বলিয়া আমি এরূপ ইচ্ছাকে মনে উঠিতেই দিই না। এই মারিবার ইচ্ছা যে মনের মধ্যে আছে, তাহাও আমাদের নিকট অজ্ঞাত থাকে। এস্থলে অনেক মনোবিৎ বলিবেন, পরকে মারিবার মত অন্যায় ইচ্ছাকে মনে পরিস্ফুট হইতে দেয় না—আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান, লোকাচার প্রভৃতি। এই ব্যাখ্যা কিন্তু পর্য্যাপ্ত নহে। আমরা পরকে মারা অন্যায় বলিয়া কেন মনে করি, তাহার সদুত্তর পাই না। কেহ কেহ বলেন, সদসৎ বিচার-বুদ্ধি বা বিবেকের জন্য ন্যায়-অন্যায়

জ্ঞান হয়। কিন্তু একথা মানিলেও বিবেকের উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আমার মতে, বিরুদ্ধ ইচ্ছা হইতেই বিবেকের উৎপত্তি। পরকে মারিব এই ইচ্ছার বিরুদ্ধ ইচ্ছা—নিজে মার খাওয়া। মার খাইবার ইচ্ছা মনে সুপ্ত থাকায়, তাহার অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারি না ; কিন্তু ইহাই 'পরকে মারিব' —এই ইচ্ছাকে বাধা দেয়। আর এইজন্যই আমাদের মনে পরকে মারা অন্যায় বলিয়া জ্ঞান জন্মে। সকল প্রকার নৈতিক বিধি-নিষেধের মধ্যে এইরূপ বিরুদ্ধ ইচ্ছা বিদ্যমান। অতএব আমার মতে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইল এই যে, প্রত্যেক অজ্ঞাত ইচ্ছার আত্মপ্রকাশে যে বাধা থাকে, সেই বাধার মূলে তাহার বিরুদ্ধ ইচ্ছা বর্ত্তমান। এক ইচ্ছার বিরোধী ইচ্ছা কি, তাহা একটু বোঝা চাই। পরকে না মারা—পরকে মারার বিরোধী নহে। পরকে না মারার সহস্র কারণ থাকিতে পারে ; সুতরাং কেবল 'না মারা' বলিলে বিরোধ কোথায় বুঝিতে পারা যায় না। বিরোধে প্রয়োজন পরস্পরের প্রতিকূলতা, বিপক্ষতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিরোধে দুই পক্ষ চাই। একপক্ষ যা চায়, অপর পক্ষও যদি তাই চায়, তবেই বিরোধ ঘটে। এই বিরুদ্ধ ইচ্ছাকে

ফাঁকি দিয়া বাহির হইতে না পারিলে, অজ্ঞাত ইচ্ছার পক্ষে চরিতার্থতালাভের অন্য উপায় নাই। এই কারণে অজ্ঞাত ইচ্ছাকে ছদ্মবেশে বাহির হইতে হয়। এই ছদ্মবেশ কত প্রকারের হইতে পারে, তাহা আমরা পূর্ব্বের ষোলটি উদাহরণে দেখাইয়াছি।

এইখানে আমি কতকগুলি পরিভাষার ব্যবহার করিতেছি। এগুলি জানা থাকিলে পাঠককে স্বপ্নতত্ত্ব বোঝানো সহজ হইবে।

(১) যে ইচ্ছা অজ্ঞাত থাকিয়া স্বপ্নে প্রকাশিত হইবার চেষ্টা করে, তাহাকে আমরা **অবদমিত ইচ্ছা** বা **এষণা** (Unconscious Wish বা Complex) বলিব।

(২) এই রুদ্ধ বা অবদমিত ইচ্ছার আত্মপ্রকাশের যে অন্তরায়, তাহাকে বলিব **বাধা** বা **প্রতিবন্ধ** (Resistance)।

(৩) মনের যে-যে ভাব রুদ্ধ ইচ্ছার প্রকাশলাভে বাধা দেয়, সেগুলির সমষ্টিকে **প্রহরী** (Censor) বলিব। আমার মতে, এই প্রহরীই হইতেছে মূলতঃ রুদ্ধ ইচ্ছার বিরুদ্ধ ইচ্ছা। অন্যান্য মনোবিদেরা বলেন—ধর্ম্মজ্ঞান, নীতিজ্ঞান, পাপপুণ্যবোধ, প্রভৃতি হইতেই প্রহরীর উদ্ভব।

(৪) রুদ্ধ ইচ্ছা ছদ্মবেশে যে ক্রিয়ার দ্বারা চরিতার্থতালাভের চেষ্টা করে, সেই ক্রিয়াকে আমরা **প্রতীক-ক্রিয়া** (Symbolic Action), আর যে আকারে রুদ্ধ ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তাহাকে **প্রতীক-রূপ** (Symbolic Manifestation) বলিব। দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার সময় ঘোল খাওয়াকে প্রতীক-ক্রিয়া এবং ঘোল খাওয়ার ইচ্ছাকে দুধ খাওয়ার ইচ্ছার প্রতীক-রূপ বলিব।

রুদ্ধ ইচ্ছার সম্পর্কিত-বস্তু প্রকাশের সময় যে ছদ্মবেশ ধারণ করে, তাহাকে আমরা **প্রতীক** (Symbol) বলিব। যেমন, ঘোল দুধের প্রতীক। চিনি খাইতে ইচ্ছা, কিন্তু খাইবার উপায় নাই; তাহার বদলে স্যাকেরিন খাইলাম। এক্ষেত্রে স্যাকেরিন্ চিনির প্রতীক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্যাকেরিন্ বা ঘোলকে, চিনি বা দুধের প্রতীক বলা চলে না। কেন যে স্যাকেরিন্ বা ঘোল—চিনি বা দুধের বদলে খাইতেছি, একথা আমরা জানি, কিন্তু যদি আমি চিনি খাইতে না পাইয়া, মিষ্ট ফলের ভক্ত হইয়া পড়ি, অথচ মিষ্ট ফল কেন আমার প্রিয় তাহা বুঝিতে না পারি, তবেই মিষ্ট ফলকে চিনির প্রতীক বলা চলে। প্রতীক প্রকৃতপক্ষে কোন্ বস্তু

নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহা আমাদের অজানা থাকে। বিশ্লেষণ ছাড়া প্রতীকের স্বরূপ নির্ণয় করা অসম্ভব। স্বপ্নে আমি গৃহ দেখিলাম। বিশ্লেষণে বোঝা গেল, গৃহ আমার নিজ দেহ। এখানে গৃহই দেহের প্রতীক। অধিকাংশ প্রতীক, বিশ্লেষণেও ধরা পড়ে না, অন্য উপায়ে প্রতীকের অর্থ বাহির করিতে হয়। এরূপ স্থলে ভাষাজ্ঞান, পুরাণ, জনশ্রুতি, প্রবাদ, ইত্যাদি প্রতীকের স্বরূপ-নির্ণয়ে যথেষ্ট সহায়তা করে। আমরা দেহকে 'নবদ্বার গৃহ' বলি। দেহতত্ত্বের অনেক গানেই গৃহকে দেহের রূপক-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সাধারণ কথাতেও যখন আমরা বলি 'বাড়ীর অসুখ', তখন বুঝি 'স্ত্রীর অসুখ'। এক্ষেত্রে স্ত্রীর দেহের সহিত বাড়ীর তুলনা করা হইয়াছে। সংস্কৃতেও বলে, 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।' এইরূপ নানা বিষয়ের আলোচনা দ্বারা অনেক সময় প্রতীকের যথার্থ অর্থ বাহির করিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রতীকগুলির অর্থ প্রায় সকল দেশেই এক। প্রতীক সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকিলে স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ বাহির করা অনেক সময় সোজা হইয়া পড়ে।

স্বপ্নের বিশেষত্ব

প্রহরীকে ফাঁকি দিবার জন্য অবদমিত ইচ্ছা যে কেবল ছদ্মবেশেই প্রকাশিত হইয়া ক্ষান্ত হয়, তাহা নহে; আরও অনেক ব্যপদেশে প্রহরীর নিকট আত্ম-গোপনের চেষ্টা করে। স্বপ্নে আমাদের দার্শন-প্রতিরূপই (visual imagery) বেশী। স্বপ্ন-দর্শনকে আমরা বায়োস্কোপ-দেখার সহিত তুলনা করিতে পারি। আমাদের কোন ইচ্ছা সোজাসুজি বায়োস্কোপে দেখাইবার চেষ্টা করিলে পাঠক দেখিবেন, তাহা দর্শককে বোঝানো কত শক্ত। মনে করুন, দর্শককে বুঝাইতে চাই যে, আমি গড়ের মাঠে বেড়াইতে **যাইব**। এখানে বায়োস্কোপে দেখাইতে হইবে যে, আমি গড়ের মাঠে **যাইতেছি**। বায়োস্কোপে অন্য কোন প্রকারে ইহা বুঝাইবার উপায় নাই। স্বপ্নেও ঠিক এইরূপ ঘটে, ভবিষ্যৎ কাল বর্ত্তমানে পরিণত হয়। 'রাম আসিলে যদু যাইবে'—এই ভাবটা বায়োস্কোপে দেখাইতে গেলে প্রথমে রামের আসা দেখানো চাই, পরে যদুর যাওয়া দেখাইতে হইবে। এত করিয়াও কিন্তু বিনা ব্যাখ্যায়

দর্শককে প্রকৃত ঘটনা বুঝাইতে পারা যাইবে না। প্রথম উদাহরণে আমরা দেখিলাম যে, বর্ত্তমান ভিন্ন স্বপ্নে অন্য কোন কালের ঘটনা দেখাইতে পারা যায় না; সেইরূপ এই উদাহরণে দেখিলাম যে, সাপেক্ষ ব্যাপার, অর্থাৎ, অমুক হইলে অমুক হইবে—স্বপ্নে দেখিবার উপায় নাই। আবার মনে করুন, রাম গড়ের মাঠে যাইবে না। ইহা বায়োস্কোপে দেখাইতে হইলে, প্রথমে রামের যাওয়া দেখাইয়া তাহা মুছিয়া দিতে হইবে। নতুবা ইহা বুঝাইবার অন্য উপায় নাই। সেইরূপ, স্বপ্নে 'যাওয়া' ও 'না-যাওয়া' একই প্রকারের হইবে। স্বপ্নে 'না' দেখানো অসম্ভব। বাহুল্য ভয়ে আর উদাহরণ না দিয়া বলিতে পারি, স্বপ্নে আমরা কোন বিষয়, অথবা ঠিক তাহার বিপরীত বিষয়টি, একই রকমে দেখি। স্বপ্নে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ থাকিলে, প্রথমে কাজটি, পরে তাহার কারণটি অথবা তাহার বিপরীতও দেখি। ঘৃণা বা হাস্যরসের প্রকাশ স্বপ্নে ব্যঙ্গচিত্রের অনুরূপ। কোন লোকের বুদ্ধি কম দেখিতে হইলে, স্বপ্নে দেখিব তাহার মাথায় গোবর পোরা আছে। কাহারও মনের কুটিলতা, শরীরের বক্রতা হিসাবে দেখিতে পারি, ইত্যাদি।

পাঠক দেখিবেন, স্বপ্নে সকল জিনিষ দৃশ্যরূপে প্রকাশিত হয় বলিয়া স্বপ্নের অর্থ-নির্দ্ধারণ দুরূহ। কিন্তু এত করিয়াও সব সময়ে মনের প্রহরীকে ফাঁকি দিতে পারা যায় না। সেইজন্য স্বপ্নে আরও কতকগুলি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। একজনের উপর রাগ, স্বপ্নে ঠিক তাহার উপর প্রকাশ না পাইয়া স্বপ্ন-দৃষ্ট অপর একজন লোকের উপর প্রকাশ পাইতে পারে। এই 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপাইবার ফলে স্বপ্নের অর্থ সাধারণের পক্ষে একেবারে দুর্ব্বোধ্য হয়। স্বপ্নে যথার্থ ভীতিজনক কোন একটা ব্যাপার দেখিয়া ভয় হইল না, অথচ ভয় হইল সামান্য একটা জিনিষ দেখিয়া। এস্থলে এক বিষয়ের ভয় অপর একটা বিষয়ে গিয়া পড়িল। ইহাকে **অভিক্রান্তি** (Displacement) বলা হয়। ইহা ছাড়া স্বপ্নে দেখা একই বস্তু দুই বা ততোধিক বস্তুকে বুঝাইতে পারে। আমি হয় ত দেখিলাম নিজের ঘরে আছি, কিন্তু ঘরের আসবাব-পত্রের সহিত কলেজের আসবাবপত্রের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এস্থলে কলেজ ও নিজের ঘর দুইটিই একই বস্তুর দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ইহাকে **সংক্ষেপণ** (Condensation) বলে। এই সংক্ষেপণের ফলে

অতি বৃহৎ ব্যাপারও অতি ক্ষুদ্র আকারে স্বপ্নে প্রকাশিত হইতে পারে, একই ব্যক্তি অনেক ব্যক্তির পরিজ্ঞাপক হইতে পারে, ইত্যাদি। আবার এমনও হয় যে, এক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপর আরোপিত হইয়া, সেই ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় প্রচ্ছন্ন করিতে পারে। ধরুন, স্বপ্নে দেখিলাম এক জায়গায় চারিজন লোক বসিয়া আছে। তাহাদের একজনের মাথার চুল সাদা, একজনের দাড়ি আছে, একজন খোঁড়া, আর একজন বেঁটে। এস্থলে চারি ব্যক্তির প্রকাশ পৃথক পৃথক না হইয়া একটি খর্ব্বকায় বৃদ্ধ খঞ্জকে নির্দ্দেশ করিতে পারে। অবাধ-অনুষঙ্গ-ক্রমের সাহায্য ব্যতীত এই-সকল ক্ষেত্রে স্বপ্নের অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব। কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন কারণের সমবায়ে কোন একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিলে স্বপ্নে দৃষ্ট সেই ঘটনা সকল কারণেরই পরিচায়ক। যেমন, বাগবাজারে আমার কোন প্রিয় ব্যক্তি থাকেন, আর বাগবাজারে রসগোল্লাও পাওয়া যায়। স্বপ্নে বাগবাজার দেখার অর্থ এরূপ ক্ষেত্রে আমার প্রিয় ব্যক্তির নিকট যাওয়াও বটে, এবং রসগোল্লা খাওয়াও বটে। ইহাকে **অতিলক্ষ** (Over-determination) বলে।

উপন্যাস-বর্ণিত কোন ঘটনা দৃশ্যরূপে দেখাইতে

হইলে, তাহাকে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করা দরকার। এই পরিবর্ত্তনের ফলে অনেক সময় ঘটনা-সমাবেশের অল্পবিস্তর ওলটপালট এবং বর্ণিত বিষয়ের অর্থ বুঝাইবার নিমিত্ত নূতন ঘটনাও যোগ করিতে হয়। স্বপ্নেও ঠিক এই ধরণের ব্যাপার দেখা যায়। ইহাকে **নাটকীয় পরিণতি** (Dramatization) বলে।

আমরা দেখিলাম যে, কতকগুলি উপায়ে স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ বিকৃত আকারে প্রকাশিত হয়। যেমন—

(১) **দার্শন-পরিণতি**—Visualization
(২) **অভিক্রান্তি**—Displacement
(৩) **সংক্ষেপণ**—Condensation
(৪) **নাটকীয় পরিণতি**—Dramatization

ইহা ছাড়া জাগ্রৎ অবস্থায় বর্ণনাকালে স্বপ্নের বিকৃতি অসম্ভব নহে। স্বপ্নে দেখা কোন অসংলগ্ন ঘটনা বর্ণনা করিবার সময় আমরা অজ্ঞাতসারে তাহাতে রং ফলাইয়া বর্ণনার উপযোগী করিয়া তুলি। যে-সকল স্বপ্ন একেবারেই খাপছাড়া, তাহা বর্ণনাকালে বাস্তবিক স্বপ্নে যাহা দেখি নাই, এমন দুই-চারিটি কথাও আমাদের অজ্ঞাতসারে আসিয়া পড়ে। ইহাকে **অনুযোজনা** (Secondary Elaboration) বলা হয়।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে অজ্ঞাত ইচ্ছার বিরোধী ইচ্ছা-সমূহের সমষ্টির নাম প্রহরী। মূল ইচ্ছার আত্মপ্রকাশের পথে বাধা আছে বলিয়াই তাহা বিকৃত আকারে স্বপ্নে দেখা দেয়। সেই রূপান্তরিত ইচ্ছা মনের প্রহরীকে এড়াইয়া জ্ঞানে উপলব্ধ হইতে পারে। প্রহরী স্বপ্নের অর্থ বুঝিতে পারে না বলিয়াই স্বপ্নকে প্রকাশিত হইতে দেয়। যাই স্বপ্নের অর্থ ধরা পড়ে, অমনি স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। যে-সকল ভাব আমরা মনের মধ্যে জাগ্রৎ অবস্থায় আনিতে চাই না—অন্যায় বা ভয়ঙ্কর বলিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি—তাহাই স্বপ্নে প্রকাশ পাইলে মন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। পাঠক দেখিলেন যে, ভয়ের স্বপ্নতেও ইচ্ছার পূর্ণতালাভের চেষ্টা আছে।

মনের প্রহরী যত সজাগ থাকিবে, স্বপ্ন ততই বিকৃত আকারে প্রকাশ হইবে। প্রহরী কাজে ঢিলা দিলে স্বপ্নের মূল ইচ্ছা অবিকৃত অবস্থায় মনে উঠিতে পারে। এইরূপ অবিকৃত স্বপ্ন দেখিলে সাধারণতঃ মন দারুণ

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়ে ভরিয়া উঠে। জাগ্রৎ অবস্থায় মনের প্রহরী সদাই সজাগ। নিদ্রাকালে প্রহরীর কার্য্যে শৈথিল্য ঘটে; কেন ঘটে, সে বিষয়ে মনোবিদেরা একমত নহেন। এ-সম্বন্ধে আমার নিজের মত পরে ব্যক্ত করিব। যে কারণেই হউক, প্রহরীর সতর্কতা কমিলেই স্বপ্নের উদয় হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বপ্ন ভুলিয়া যাওয়াই আমাদের স্বভাব। পাঠক এখন ইহার কারণও বুঝিতে পারিলেন। এই ভুলিয়া যাওয়ার মূলে প্রহরীর কার্য্যকরী শক্তি বর্ত্তমান। স্বপ্নটি ভুলাইয়া দিতে পারিলে প্রহরী নিশ্চিন্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনেও শান্তি আসে।

স্বপ্নের রুদ্ধ ইচ্ছা

মনের যে-সকল অপূর্ণ ইচ্ছা স্বপ্নে কাল্পনিক পরিতৃপ্তি-লাভের চেষ্টা করে, সেগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি—

(১) যে-সকল ইচ্ছা জ্ঞানগত এবং যাহার পূর্ণতা-লাভের পথে আমাদের কোন আপত্তি নাই। যেমন, মনে করিয়াছি বই লিখিব, কিন্তু লেখা এখনও ঘটিয়া উঠে নাই।

(২) যে-সকল ইচ্ছা জ্ঞানগত, অথচ তাহাদের পূর্ণতালাভের পক্ষে মনে বাধা। ধরুন, পরের কোন ভাল জিনিষ দেখিয়া আত্মসাৎ করিবার লোভ হইল। এরূপ ইচ্ছা মনে উঠিবামাত্র তাহা অন্যায় বলিয়া মন হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছি।

(৩) যে-সকল ইচ্ছার অস্তিত্ব আমাদের নিকট অজ্ঞাত। এগুলিকে আমরা অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি।

স্বপ্নে এই তিন প্রকার ইচ্ছারই পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক স্বপ্নেই আপাতদৃষ্টিতে কেবল প্রথম দুই

প্রকার ইচ্ছার অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমরা মনে করি; কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে শেষোক্ত অজ্ঞাত রুদ্ধ বা অবদমিত ইচ্ছারও সন্ধান মিলিবে। বাস্তবিক এই অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছাই স্বপ্ন-দেখার প্রধান কারণ। পূর্ব্বের তিন প্রকার ইচ্ছা ছাড়াও নিদ্রাকালে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম প্রভৃতি শারীরিক বৃত্তিগত যে-সকল ইচ্ছার উদয় হয়, স্বপ্নে সেগুলিরও কাল্পনিক পরিতৃপ্তিলাভ ঘটে। আমাদের দৈনন্দিন যে-সকল কাজ অসমাপ্ত থাকিয়া যায়, তাহার কোন-না-কোনটির আভাস প্রায় প্রত্যেক স্বপ্নেই পাওয়া যায়। এই অসমাপ্ত-কার্য্যজনিত অতৃপ্ত ইচ্ছাকে আশ্রয় করিয়া অন্যান্য অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছা স্বপ্নে প্রকাশ-লাভের চেষ্টা করে। তাই অনেকে মনে করেন, দৈনন্দিন ঘটনাই বুঝি আমাদের স্বপ্নের আধার; স্বপ্নে বুঝি-বা কেবল দৈনিক ঘটনারই আভাস থাকে। দৈনন্দিন ঘটনামূলক স্বপ্ন প্রথমে অতি সাদাসিদে ঠেকিলেও, বিশ্লেষণ করিলে তাহাদেরও মূলে অনেক অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছার সন্ধান পাওয়া যাইবে।

স্বপ্নে কি ধরণের অজ্ঞাত ইচ্ছা আত্মপ্রকাশ করে, পাঠককে তাহার কিছু আভাস দিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাম-জনিত ও অন্যান্য শারীরিক বৃত্তিগত

অনেক ইচ্ছার অস্তিত্ব স্বপ্নে প্রচুর থাকে। নানা সদ্-ইচ্ছাও স্বপ্নে দেখা দিতে পারে। যে-সকল ইচ্ছা আমাদের চক্ষে অন্যায়, অথচ যাহা জাগ্রৎ অবস্থাতেও মাঝে মাঝে মনে উঠিয়া থাকে, তাহাও স্বপ্নে অভিব্যক্ত হয়। এ শ্রেণীর ইচ্ছা এমন-কিছু বৈচিত্র্যপূর্ণ নহে যে তাহার বিশেষ পরিচয় আবশ্যক। কিন্তু কি-কি অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছা স্বপ্নে প্রকাশিত হয়, তাহা জানিবার জন্য পাঠকের স্বভাবতঃ কৌতূহল হইবে। এই অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছাগুলির বিশেষত্ব এই, আমরা সাধারণতঃ তাহাদের অস্তিত্ব ত জানিই না, পরন্তু কেহ দেখাইয়া দিলেও সেগুলিকে নিতান্ত অদ্ভুত, উৎকট, অসম্ভব, অশ্লীল ইত্যাদি বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়া মানিতে অস্বীকার করি। সুতরাং এই-সকল অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছার বিবরণ দিলেও স্বপ্নে যে সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ পাইতে পারে, পাঠকের তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। তবে এখানে বলা আবশ্যক যে, অনেক মনোবিৎ পণ্ডিত বহু ব্যক্তির স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অনেকে মনে করেন, কেবল মানসিক-বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মনেই এরূপ উৎকট অশ্লীল বীভৎস ভাব থাকা সম্ভব। কিন্তু

সম্পূর্ণ সুস্থচিত্ত ব্যক্তির স্বপ্নেও এই অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছাগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব শুনিতে বীভৎস ঠেকিলেও পাঠক যেন সিদ্ধান্ত না করেন যে, তাঁহার মনে এরূপ ইচ্ছার অস্তিত্ব আদৌ অসম্ভব। আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই যে অনেক বীভৎস কুটিল ও অশ্লীল ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, নানা দিক হইতে আমরা তাহার প্রমাণ পাই।

আমি যে-সকল অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছার বিবরণ দিব, কিরূপ প্রমাণের বলে তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা বলিতে গেলে পুস্তকের কলেবর বাড়িয়া যায়। সুতরাং প্রমাণের উল্লেখ না করিয়া বিভিন্ন দেশের মনোবিদ্‌গণ যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এখানে তাহাই বলিব।

পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন, অধিকাংশ অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছাই কামজ। জনসাধারণের ধারণা, কাম-প্রবৃত্তি বুঝি কেবল স্ত্রীপুরুষের মিলনেচ্ছাতেই পর্য্যবসিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কামের অধিকার বহুবিস্তৃত। এই কাম-প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কিছু ধারণা না জন্মিলে, অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছার বিষয় কিছুই বোঝা যাইবে না। সুতরাং কাম-প্রবৃত্তির উন্মেষ ও বিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক।

মানুষের কাম একটি নিসর্গজ বা সহজ-প্রবৃত্তি (instinct), বংশ-রক্ষার মূলে এই প্রবৃত্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান। অধিকাংশ লোকের ধারণা, যৌবনেই কাম-প্রবৃত্তি প্রথম উন্মেষিত হয়; বাল্যে বা শৈশবে বুঝি ইহার অস্তিত্ব থাকে না। সত্য বটে, যৌবনে যে-ভাবে কামের প্রকাশ হয়, বাল্যে সে-ভাবে হয় না। কিন্তু মনোবিদ্‌গণের মতে, কাম বহুমুখী, নিতান্ত শৈশবেও নানাভাবে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ফ্রয়েড বলেন, কাম-বৃত্তির বিশ্লেষণ করিলে, তাহার তিনটি অঙ্গ দেখা যায়—(১) কামানুভূতি (Sexual feeling), (২) কাম-চেষ্টা (Sexual aim) ও (৩) কাম-পাত্র (Sexual object). সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের কাম আলোচনা করিয়া আমি এই অঙ্গ তিনটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পরস্পর যে অনুরাগ ও পরস্পরের সঙ্গলাভে যে সুখ, তাহাই **কাম-ভাব** বা **কামানুভূতি**। পরস্পরের আলিঙ্গন সহবাসাদির যে চেষ্টা, অর্থাৎ যে কায়িক বা মানসিক ব্যাপারকে উদ্দেশ্য করিয়া কাম-ভাব বিকশিত হয় সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রয়াসই **কাম-চেষ্টা**। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষই **কাম-পাত্র**। ফ্রয়েড

বলেন, কাম-বৃত্তির তিনটি অঙ্গের প্রত্যেকটির বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপে হইতে পারে। রতি-সুখ হইতে আরম্ভ করিয়া স্ত্রীপুরুষের পরস্পর কথোপকথনের আনন্দ পর্য্যন্ত সকল-প্রকার অবস্থাতেই কাম-ভাব ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, স্ত্রী-পুরুষের কথোপকথনের যে আনন্দ, তাহা রতি-সুখ হইতে ভিন্ন। কিন্তু এই সকল-প্রকার সুখই সেই একই কামানুভূতির রূপান্তর মাত্র। কাম-চেষ্টাও এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। স্ত্রীপুরুষের মিলনের উদ্দেশ্য, কখন পরস্পরের সঙ্গলাভ কখন-বা রতি-ক্রিয়া। এই-সব বিভিন্ন প্রকার চেষ্টার মূলে কিন্তু সেই একই কাম-প্রেরণা বর্ত্তমান। কাম-পাত্রও সকল সময় এক না হইতে পারে। পুরুষ্ আজ যে স্ত্রীলোককে ভালবাসে, কাল তাহাকে ভাল না বাসিয়া অপর এক স্ত্রীলোকে আসক্ত হইতে পারে। স্ত্রীলোকের ভালবাসার পাত্রও সেইরূপ একাধিক ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নহে। একই সময়ে একই পুরুষ বা একই স্ত্রীলোক, দুই বা ততোধিক ব্যক্তিতে আসক্ত হইতে পারে।

তাহা হইলে দেখা গেল, কাম-বৃত্তির বিকাশ কোন-একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। মনোবিদেরা

বলেন, 'কামগন্ধহীন' পবিত্র প্রেমও সেই আদি কাম-ভাবেরই রূপান্তর মাত্র। সেইরূপ, সখীত্ব বন্ধুত্ব ইত্যাদির মূলেও কামগন্ধ রহিয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, কাম-বৃত্তি বিকশিত হইলে পুরুষ স্ত্রীলোককে এবং স্ত্রীলোক পুরুষকে ভালবাসে। প্রীতি ও কাম এক। এই কাম চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবি 'পীরিতি' নামে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পুরুষে পুরুষে, নারীতে নারীতে স্বামি-স্ত্রীর ন্যায় প্রীতিও বিরল নহে। কোন পুরুষ বন্ধুর উদ্দেশে লিখিত কতকগুলি সনেটে শেক্‌সপীয়ার স্বামি-স্ত্রীর ন্যায় প্রেমভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে অস্কার ওয়াইল্‌ডের একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ আছে। প্রভাতকুমারের 'ষোড়শী' পুস্তকের "প্রিয়তম" গল্পেও দুই সখীর মধ্যে এইরূপ প্রেমভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ফ্রয়েড বলেন, এরূপ স্থলে কামের কেবল পাত্র-ভেদ হইয়াছে। সাধারণ বন্ধুত্ব ও সখীত্বকেও কাম-প্রেরণার রূপান্তর বলিয়া ধরিলে বলা যায়, তাহাতে কাম-পাত্র ও কাম-চেষ্টা—এই দুই অঙ্গের প্রকার-ভেদ হইয়াছে মাত্র। এই বন্ধুত্ব ও সখীত্ব-বন্ধনের মধ্যে অতি দূষণীয় সমকামিতা (homo-sexual relationship) হইতে আরম্ভ

করিয়া, পবিত্র বন্ধুভাব পর্য্যন্ত, সকল প্রকার স্তরই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে বোঝা যায়, সমকামিতা (homo-sexuality) ও বন্ধুত্বের মূলে একই ভাব বর্ত্তমান। ফ্রয়েড কামের অধিকার কত বিস্তৃতভাবে দেখিয়াছেন, পাঠক এখন তাহার কিছু আভাস পাইলেন। আমরা বলিতে পারি, ভ্রাতৃপ্রেম, ভগিনী-প্রেম, মাতৃপ্রেম, সন্তান-প্রেম, পিতৃভক্তি, ঈশ্বর-ভক্তি প্রভৃতি সকল প্রকার প্রেমই কামজ। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও কামকে 'আদিরস' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই-সব পবিত্র স্নেহবন্ধনের মধ্যে যে আবার কাম-ভাব থাকিতে পারে, এ কথা অনেকে হয় ত হঠাৎ বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু সংসারে এই-সকল পবিত্র বন্ধনও কখন কখন কলুষিত হইতে দেখা গিয়াছে। মানব-মনের অন্তরালে কলুষ-ভাব প্রচ্ছন্ন না থাকিলে, কখনও তাহা ফুটিয়া বাহির হইবার অবকাশ পাইত না। মনুসংহিতায় (২য় অধ্যায়, শ্লোক ২১৫) আছে,—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।

অর্থাৎ, 'মাতা, ভগিনী বা কন্যার সহিত কখনও নির্জ্জনে অবস্থান করিবে না। কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাম

বলবান ; বিদ্বান্ ব্যক্তিও তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইতে পারেন।' ফ্রয়েড বলেন, আমাদের প্রত্যেকেরই মনে স্নেহ-বন্ধনের সহিত কাম-ভাব বিজড়িত। এই কাম-ভাব মনে অজ্ঞাত থাকায়, কেহ তাহা দেখাইয়া দিলেও মানিতে চাই না। স্বপ্নে এইরূপ অজ্ঞাত ইচ্ছা সময়ে-সময়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে, আর তাহার ফলে মনে দারুণ ক্ষোভ ঘৃণা ও লজ্জার সঞ্চার হয়। মানুষের কাম-পাত্র যে কেবল মানুষই হইবে, এমন কোন কথা নাই। আমরা নানা জীবজন্তু ভালবাসিয়া থাকি। এই ভালবাসা কেবল সচেতন বস্তুতেও আবদ্ধ নহে ; আমরা অচেতন ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র ইত্যাদিও ভালবাসি। সকল-প্রকার ভালবাসাই কিন্তু মূলে এক। ভাষাতত্ত্বও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। একই কথা 'ভালবাসা' আমরা সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহার করিয়া থাকি।

ফ্রয়েড বলেন, শিশুর মনের মধ্যে সকল-প্রকার কামানুভূতির বীজ রহিয়াছে। শিশুকে তিনি sexually polymorpho-perverse বা 'কাম-বহুরূপী' বলেন ; অর্থাৎ শিশুকে যেরূপ কামের শিক্ষা দেওয়া যাইবে, তাহার প্রবৃত্তিও তদনুরূপ গড়িয়া উঠিবে।

সকল-প্রকার কাম-ভাবের উন্মেষের সম্ভাবনা তাহার মধ্যে আছে। ফ্রয়েডের মতে, শিশুর স্তন্য-পান, আঙ্গুল-চোষা প্রভৃতিও কামজ-ব্যাপার। শিশুর ভালবাসার প্রথমতঃ কোন পাত্র থাকে না। নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ইত্যাদি কষ্টের লাঘব হইলেই সে সন্তুষ্ট। ক্রমশঃ নিজের সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান জন্মে; তখন বাহ্য বিষয় হইতে সে নিজেকে পৃথক বলিয়া মনে করে। পরে বিষয়-জ্ঞান জন্মিলে ক্রমে ক্রমে তাহার মন পরিণতি লাভ করে। কোন ব্যক্তির ভালবাসা বিশ্লেষণ করিলে যদি আমরা দেখি যে, তিনি কেবল ভালবাসিব বলিয়াই ভালবাসেন, তবে তাঁহার ভালবাসাকে স্বতঃরতি (auto-eroticism) বলা যাইতে পারে; যদি তাঁহার মন ভালবাসার পাত্রের প্রতি উৎসুক হইয়া থাকে, তবে সেই ভালবাসাকে বিষয়-রতি (object love); আর ভালবাসা-জনিত নিজের সুখের দিকেই যদি তাঁহার মন ধাবিত হয়, তবে তাহাকে স্ব-রতি (narcissism, সংক্ষেপে narcism) বলিতে পারি। একমাত্র সুখের জন্যই শিশুর যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা auto-eroticism বা স্বতঃরতি। এস্থলে শিশু কোন

ব্যক্তি বা বস্তুকে ভালবাসিতেছে না, সে কেবল সুখের সন্ধানেই ব্যস্ত।

গ্রীক পুরাণে নার্সিসাস্ দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া নিজেকে ভালবাসিয়াছিলেন। নিজ সুখের জন্য যে চেষ্টা, বা নিজেকে ভালবাসিবার যে ইচ্ছা, তাহাকে narcissism বা স্ব-রতি বলে। বস্তুজ্ঞান জন্মিলে সমলৈঙ্গিক ব্যক্তির উপর শিশুর যে ভালবাসা, তাহাকে সমকামিতা (homo-sexuality) এবং বি-ষম লৈঙ্গিক ব্যক্তির উপর যে ভালবাসা, তাহাকে ঐতর কামিতা (hetero-sexuality) বলা হয়। এই ঐতর-কামিতা সর্ব্বশেষে বিকাশলাভ করে। প্রথমে স্বতঃ-প্রীতি, পরে স্ব-রতি, তৎপরে সমকামিতা, সর্ব্বশেষে ঐতর-কামিতা বিকশিত হয়। পুত্র শৈশবে মাতাকে নিজেরই সমলিঙ্গ মনে করে। জ্ঞান হইলে নিজের ভুল বুঝিতে পারে। বহু পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই-সকল সত্য নির্ণীত হইয়াছে। অনেক সময় কাম-প্রবৃত্তির উন্মেষের পথে নানারূপ বাধা জন্মে; তখন পূর্ব্বের চারি প্রকার প্রীতির মধ্যে কোন-কোনটির সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না, আবার কোন-কোনটি অতি-মাত্রায় বিকশিত হইয়া থাকে। যাঁহার মধ্যে স্বতঃপ্রীতি

প্রবল, তিনি কেবল সকল-প্রকার সুখের জন্যই লালায়িত। এই সুখের নেশায় তিনি নিজের শারীরিক অনিষ্টকেও ভ্রূক্ষেপ করেন না। যাঁহার মধ্যে স্ব-রতি পরিস্ফুট, তিনি আত্মসুখপরায়ণ হন, কিন্তু আপাত-সুখের জন্য তিনি এমন-কোন কাজই করেন না যাহাতে নিজের শারীরিক অনিষ্ট হইতে পারে। যাঁহার মধ্যে সমকামিতা সমধিক, তিনি বন্ধুবান্ধব লইয়াই থাকিতে ভালবাসেন। যাঁহার মধ্যে ঐতর-কামিতা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত, তাঁহার নিজ সংসারে আসক্তি প্রবল। পাঠক মনে রাখিবেন, আমাদের সকলের মধ্যেই সকল-রকম প্রীতি অল্পবিস্তর আছে। তবে তাহার মধ্যে কোন-একটি প্রবল হইলেই উপরিউক্ত একদেশী বিশেষত্ব দেখা যায়। যেমন, কোন পুরুষের মনে যদি সমকামিতা প্রবল থাকে, তবে তিনি কখনই স্ত্রীকে ভালবাসিতে পারিবেন না, ইত্যাদি।

উপরে যে চারি প্রকার প্রীতির বা কামের কথা বলিলাম, তাহার সকলগুলি অল্পবিস্তর পরস্পর-বিরোধী, কাজেই আমাদের জ্ঞানে সবগুলির একদা ও একত্র সমাবেশ সম্ভবপর নহে। মানুষের মধ্যে ঐতর-কামিতাই স্বাভাবিক। কিন্তু কাহারও মধ্যে

ঐতর-কামিতা পরিস্ফুট হইলেই যে আর কোন কাম থাকিবে না, এমন কথা নাই। অন্য কামগুলি আমাদের অজ্ঞাতে মনোমধ্যে রুদ্ধ ইচ্ছারূপে অবস্থান করে। এই-প্রকার রুদ্ধ অবদমিত ইচ্ছা স্বপ্নে প্রায়ই আত্মপ্রকাশে সচেষ্ট হয়। স্বপ্নে সমকামিতা, স্ব-রতি ও স্বতঃরতি-মূলক ইচ্ছার আভাস প্রায়ই পাওয়া যায়।

এইবার কাম-চেষ্টা সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব। কাম চেষ্টার অর্থ যে কেবল রতি-ক্রিয়া তাহা নহে। ভালবাসার পাত্রকে নিজের রূপ-প্রদর্শন (exhibitionism) ও তাহার রূপ-দর্শনও (observationism) কাম চেষ্টামূলক। অনেকে হয় ত শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন, প্রেমাস্পদকে পীড়ন করা (sadism), কিংবা তাহার দ্বারা নিপীড়িত হওয়াও (masochism) কাম-চেষ্টা রূপে দেখা দিতে পারে। রতিকালে চুম্বন, আলিঙ্গন, দংশন ও প্রেমপাত্র বা পাত্রীর অন্যবিধ নির্যাতন স্বাভাবিক। বাৎসায়ন এ-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এগুলি সমস্তই পীড়নেচ্ছা-প্রসূত। অপর পক্ষে প্রেমপাত্র বা পাত্রীর দ্বারা নিপীড়িত হওয়াও সময়-সময় সুখকর বোধ হইতে পারে। এই সুখ নিপীড়িত হইবার ইচ্ছা হইতে

উদ্ভূত। আমাদের সকলের মধ্যেই এই-সকল ইচ্ছা বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এই পরস্পর-বিরোধী ভাবগুলি—যেমন, প্রেমাস্পদের রূপ দেখা বা তাহাকে নিজ রূপ দেখানো, তাহাকে পীড়ন করা বা তাহার দ্বারা নিপীড়িত হওয়া—চেতনায় যুগপৎ প্রকাশ পাইতে পারে না। দুইটি বিরুদ্ধ ভাবের একটি রুদ্ধ ইচ্ছারূপে মনের মধ্যে থাকিয়া যায়। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, পুরুষের নিপীড়িত হইবার ইচ্ছা, স্ত্রীলোকের নিপীড়নের ইচ্ছা, পুরুষের রূপ দেখাইবার ইচ্ছা ও স্ত্রীলোকের রূপ দেখিবার ইচ্ছা অজ্ঞাতভাবে মনের মধ্যে থাকে। এই দুই শ্রেণীর ইচ্ছার মধ্যে যেটি মনে রুদ্ধ থাকে, স্বপ্নে তাহা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। এই রুদ্ধ ইচ্ছাগুলি কেবল যে স্বপ্নেই প্রকাশলাভের চেষ্টা করে তাহা নহে, আমাদের অজ্ঞাতে অনেক কাজেই তাহা চরিতার্থতালাভ করে। পরের অধীনে চাকরি করিবার ইচ্ছা পুরুষের নিপীড়িত হইবার ইচ্ছার রূপান্তর মাত্র। স্ত্রীলোকের আড়ি পাতিয়া দেখার ইচ্ছা রূপ দেখিবার ইচ্ছার রূপান্তর। সেইরূপ, স্বামীকে বশে রাখিবার ইচ্ছাও স্ত্রীলোকের পীড়নের ইচ্ছার রূপমাত্র। অপর পক্ষে

বলা যাইতে পারে, পুরুষের বাহুবল বা বীরত্ব দেখাইবার ইচ্ছা নিজের রূপ দেখাইবার ইচ্ছার রূপান্তর।

শিশুর কাম-ইচ্ছা উন্মেষিত হইলে তাহা পাত্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়; তখন প্রথমেই তাহার সেই পাত্র—মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাতৃভক্তি পিতৃভক্তি ইত্যাদির মূলে কাম বিদ্যমান। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নানা কারণে শিশুর আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কাম-ভাব—ভক্তি, স্নেহ ইত্যাদিতে পরিণত হয়। অনেক মনোবিদের মতে শিক্ষা, সামাজিকতা, শাসন ইত্যাদিই প্রিয়পরিজনের উপর শিশুর কামভাব-সঞ্চারের অন্তরায়। স্বভাবতঃ মানুষের মনে এমন-কোনও বাধা নাই যাহাতে সে আত্মীয়স্বজনের প্রতি কামভাবাপন্ন না হইতে পারে। কেবল শিক্ষা ইত্যাদির ফলেই তাহার নিকট এরূপ ইচ্ছা অসৎ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যা পর্য্যাপ্ত নহে। আমার মতে, কামেচ্ছার এক বিরুদ্ধ ইচ্ছাই আমাদিগকে নিকট-আত্মীয়ের প্রতি কামাসক্ত হইতে দেয় না। আগেই বলিয়াছি, বাধা যদি কেবল বাহিরের হইত, তবে ইচ্ছা আমাদের অজ্ঞাত থাকিত না;

কেননা, বাহিরের বাধা মনের কোন ইচ্ছাকে সংবিৎ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারে না। নির্ব্বাসিত করিতে হইলে দরকার—অপর একটি ইচ্ছা। সেইরূপ এখানে প্রিয়পরিজনের প্রতি কামাসক্ত না হইবার মূল কারণ —একটি বিরুদ্ধ ইচ্ছা। যে-প্রকারেই হউক, অধিকাংশ স্থলেই নিকট-আত্মীয়ের প্রতি কাম-ভাব আমাদের মনের মধ্যে উঠে না, অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছারূপেই মনে থাকিয়া যায়। অনেক স্বপ্নে এই-প্রকার অবদমিত ইচ্ছা চরিতার্থতালাভের চেষ্টা করে। সময়ে-সময়ে মনের প্রহরীর অসাবধানতায় এইরূপ ইচ্ছা স্বপ্নে স্পষ্ট দেখা দেয়; তাই নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই দারুণ ক্ষোভ, ঘৃণা বা আতঙ্কে মন ভরিয়া উঠে।

আরও এক প্রকারের অজ্ঞাত ইচ্ছা প্রায়ই স্বপ্নে প্রকাশিত হইবার চেষ্টা করে। জীবতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায়, কতকগুলি প্রাণীর লিঙ্গ-ভেদ নাই। একই শরীরে পুরুষ ও স্ত্রীর উভয়বিধ লক্ষণ আছে। এই-সকল প্রাণীকে Hermaphrodite বা উভলিঙ্গ বলে। অনেকের মতে ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে পুরুষ ও নারী-প্রকৃতি ক্রমশঃ পৃথক হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য প্রত্যেক নারী-দেহে কিছু কিছু পুরুষের লক্ষণ এবং

প্রত্যেক পুরুষের দেহে কিছু কিছু স্ত্রী-লক্ষণ দেখা যায়। শারীরবিদ্‌গণের মতে, প্রত্যেক মানুষের শরীরেই স্ত্রী ও পুরুষ—উভয়বিধ লক্ষণই রহিয়াছে। অবশ্য পুরুষ-শরীরে স্ত্রী-লক্ষণ ও স্ত্রী-শরীরে পুং-লক্ষণ তত পরিস্ফুট নহে। মনোজগতের দিক দিয়া দেখিলে বলা যায়, প্রত্যেক পুরুষের মনে স্ত্রী-ভাব ও প্রত্যেক নারীর মনে পুরুষ-ভাব বর্ত্তমান আছে। আমাদের ভাষায় বলিতে গেলে, নরের নারী হইবার ইচ্ছা ও নারীর নর হইবার ইচ্ছা প্রত্যেকের মনে অজ্ঞাত রহিয়াছে। স্বপ্নে এই ইচ্ছা প্রকাশিত হইতে দেখা যায়।

মোটামুটি বলা যাইতে পারে, নিম্নলিখিত অজ্ঞাত ইচ্ছাগুলি স্বপ্নে প্রকাশ পাইয়া থাকে—

(১) স্বতঃকামেচ্ছা—Auto-erotic wish
(২) স্ব-কামেচ্ছা—Narcisistic wish
(৩) সমকামেচ্ছা—Homo-sexual wish
(৪) সাদন-কামেচ্ছা—Sadistic wish
(৫) মর্ষণ-কামেচ্ছা—Masochistic wish
(৬) বিলসন-কামেচ্ছা—Exhibitionistic wish
(৭) ঈক্ষণ-কামেচ্ছা—Observationistic wish
(৮) অজাচারেচ্ছা—Incestuous wish

(৯) নরের নারী হইবার ও নারীর নর হইবার ইচ্ছা—Opposite wish.

(১০) নানা প্রকারের বিকৃত-কামেচ্ছা ; যেমন বিযোনিজ মৈথুনেচ্ছা, তির্য্যক-মেহনেচ্ছা, বস্তুরতি (Fetichism) ইত্যাদি—Perverse wishes.

পূর্ব্বোক্ত ইচ্ছাগুলি ব্যতীত আরও অনেক-প্রকার ইচ্ছা স্বপ্নে প্রকাশ পাইতে পারে। এগুলি সাধারণতঃ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত না হইলেও মনে অপরিস্ফুট আকারে থাকে ; যেমন,—

(১১) পর-স্ত্রী বা পর-পুরুষের প্রতি কামেচ্ছা—Hetero-sexual wish

(১২) প্রিয়পাত্রের প্রতি শত্রুভাব

(১৩) যে-সকল ইচ্ছা মনে পরিস্ফুট, অথচ সামাজিক বা নৈতিক-শাসনে চরিতার্থ হইতে পায় না।

(১৪) নিদ্রাকালে শারীরবৃত্তিমূলক মলমূত্র ও রতিবেগ-জনিত ইচ্ছা, শীতগ্রীষ্মাদি নিবারণের ইচ্ছা, ইত্যাদি।

স্বপ্নের উপাদান

প্রায়ই দেখা যায়, অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছা কিছু আশ্রয় করিয়া স্বপ্নে প্রকাশ পায়। অবদমিত ইচ্ছার এই অবলম্বন নানারূপ হইতে পারে। প্রাত্যহিক কার্য্যে আমাদের অনেক চিন্তা, অনেক ইচ্ছাই অপরিতৃপ্ত থাকিয়া যায় ও নিদ্রাকালে আমাদের মনে উঠিয়া থাকে, আর সেই চিন্তাধারাকে আশ্রয় করিয়া মনের অনেক অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছাও প্রকাশলাভের সুযোগ পায়। পূর্ব্বে "ক"-বাবুর যে স্বপ্নের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে "ষ্টুডিও ভাঙ্গিয়া পড়িবার" কথা আছে। "ক"-বাবু যে-রাত্রিতে এই স্বপ্ন দেখেন, সেদিন দিনের বেলা হয় ত ষ্টুডিও-মেরামতের কথা তাঁহার মনে উঠিয়াছিল। অবশ্য এক্ষেত্রে এ কথার কোনও প্রমাণ নাই। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে প্রত্যেক স্বপ্নেই দৈনন্দিন কার্য্যের বা ঘটনার কোন-না-কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। দিনের বেলা আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখিয়া রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম, বাঘে তাড়া করিয়াছে। অনেকে মনে করিতে পারেন, আলিপুরে বাঘ-দেখাই এরূপ স্বপ্ন-

দেখার কারণ হিসাবে যথেষ্ট। কিন্তু কেবল বাঘ-দেখাকেই স্বপ্নের কারণ বলিয়া মানিলে, বাঘে কেন তাড়া করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। এস্থলে বুঝিতে হইবে, বাঘ-দেখা-রূপ বাস্তব ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া মনের কোন রুদ্ধ ইচ্ছা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিয়াছে। দৈনন্দিন ঘটনার আভাস যেমন প্রত্যেক স্বপ্নে বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ নিদ্রাকালের অনুভূতিও স্বপ্নের সঙ্গে অল্পবিস্তর সংশ্লিষ্ট থাকে। দৈনিক ঘটনা বা নিদ্রাবস্থার অনুভূতি মনের রুদ্ধ ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া স্বপ্নে বিকৃত হইতে পারে। রুদ্ধ ইচ্ছার আত্মপ্রকাশে সুবিধা হয় বলিয়াই দৈনন্দিন ঘটনার এইরূপ বিকৃতি ঘটে। মনের প্রহরী সজাগ থাকায় অবদমিত ইচ্ছাও সোজাসুজি স্বপ্নে প্রকাশিত হইতে পারে না। সময়-সময় একই অজ্ঞাত ইচ্ছা নানা আকারে বিভিন্ন স্বপ্নে প্রকাশ পাইয়া থাকে। মনোবিদেরা বলেন, একই রাত্রে একাধিক স্বপ্ন দেখিলেও, সব স্বপ্নে একই রুদ্ধ ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায়। রাত্রের প্রথম স্বপ্নটি বিশ্লেষণ করিলে হয় ত দেখা যাইবে, তাহাতে সেই রাত্রেরই পরবর্তী স্বপ্নের অনুবন্ধ বর্ত্তমান; অথবা একই ভাব দুইটি স্বপ্নে দুই রকমে প্রকাশ পাইয়াছে। একই

রাত্রের দুই বা ততোধিক স্বপ্নে বিভিন্ন প্রকারের দুইটি অজ্ঞাত ইচ্ছাকে স্বতন্ত্রভাবে পরিতৃপ্তিলাভের চেষ্টা করিতে আমি দেখি নাই। মানসিক-ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসাকালে, সময়-সময় তাহার অধিকাংশ স্বপ্নই বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয়; এরূপ ক্ষেত্রে আমি প্রায়ই লক্ষ্য করিয়াছি, রোগী উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রে যে-সব স্বপ্ন দেখিয়াছে, তাহা দেখিতে প্রথমটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রকমের ঠেকিলেও, সেগুলির মধ্যে কিন্তু একই অজ্ঞাত ইচ্ছার ইঙ্গিত রহিয়াছে। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে সময়ে-সময়ে আমরা অতি বৃহৎ স্বপ্ন দেখিতে পারি। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বীরবালা' গল্পটির আখ্যানভাগের মত স্বপ্ন-দেখাও অসম্ভব নহে। কিরূপে এ ধরণের স্বপ্ন দেখা সম্ভব হয়, সে-সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হইয়াছে। অধিকাংশ মনোবিদের মতে, পূর্ব্ব হইতেই এরূপ স্বপ্নের সমস্তটাই আমাদের মনের অজ্ঞাত প্রদেশে থাকে; তারপর অকস্মাৎ প্রকাশের বাধা সরিয়া যায়, আর সেই সুযোগে সম্পূর্ণ স্বপ্নটাই একেবারে মনে জাগিয়া উঠে। কখন কখন আমরা স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখি। সংস্কৃতে ইহার নাম স্বপ্নান্তিক। স্বপ্ন জানিয়া প্রহরী নিশ্চিন্ত থাকিলে অবদমিত ইচ্ছা প্রকাশের সুবিধা পায়।

স্বপ্নে বাল্যস্মৃতি

দৈনিক ঘটনা ও নিদ্রাকালের অনুভূতির মত, বাল্যকালের স্মৃতিও অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছার আত্মপ্রকাশে সহায়তা করিতে পারে। বিশ্লেষণ করিলে বেশীর ভাগ স্বপ্নেই শৈশবের কোন-না-কোন ঘটনার স্মৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে অবদমনের (repression) ফলে যে-সকল ইচ্ছার অস্তিত্ব আমরা বিস্মৃত হই, বাল্যকালে তাহার মধ্যে অনেকগুলি আমাদের মনে স্পষ্ট থাকে। শৈশবের ঘটনা-সমূহের সহিত পরবর্ত্তীকালের রুদ্ধ ইচ্ছা নানারূপে জড়িত ; এইজন্য স্বপ্নে বাল্যকালের ঘটনার সমাবেশ অধিক হয়। অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, শৈশবে তাঁহারা যে গৃহে বসবাস করিয়াছেন, স্বপ্নে তাহারই দৃশ্য অধিক দেখিতে পান। এই কারণে বাল্যকাল এক বাড়ীতে কাটাইয়া, পরে আর এক বাড়ীতে থাকিলেও যে বাড়ীর সহিত শৈশব-স্মৃতি বিজড়িত, সেই বাড়ীর স্বপ্নই বেশী দেখি।

সার্ব্বজনীন স্বপ্ন

কতকগুলি স্বপ্ন প্রায় সকলেই দেখিয়া থাকেন, যেমন উড়ার স্বপ্ন। এই ধরণের স্বপ্ন সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে, অথবা সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে একই ব্যক্তি প্রায় কিছুদিন অন্তর দেখিতে পারে। এইরূপ স্বপ্নকে বলা যাইতে পারে সার্ব্বজনীন স্বপ্ন, ইংরেজীতে বলে typical dreams. আকাশে উড়ার মত আরও কতকগুলি স্বপ্ন প্রায় সকলেই দেখিয়া থাকেন ; যেমন উঁচু হইতে পড়া, নগ্ন অবস্থায় বেড়ানো, দাঁত তুলিয়া ফেলা, প্রস্তুত না হইয়া পরীক্ষা দেওয়া, চোর-ডাকাত দেখা, জীবজন্তুতে তাড়া করা, সাপ দেখা, জলে ডোবা বা জল হইতে তোলা, প্রিয়পরিজনের মৃত্যু, ইত্যাদি। এই ধরণের স্বপ্ন সকল দেশের লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, আর তাহাদের অর্থেরও বড়-একটা ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অবশ্য যে যে-বিষয় জীবনে জানে নাই, শোনে নাই, সে সে-বিষয়ের স্বপ্ন দেখিবে না। আমি এই-সকল স্বপ্ন বিশ্লেষণ না করিয়া কেবল তাহাদের অর্থগুলি এখানে বুঝাইতে চেষ্টা

করিব। বহু মনোবিদের সমবেত চেষ্টায় এই-সকল অর্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এরূপ স্বপ্নের কোন-কোনটির দুই তিন রকম অর্থ বাহির হইয়াছে। তবে সকল ক্ষেত্রেই যে তাঁহারা যথার্থ অর্থ নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছেন, এ কথা বলা চলে না।

শূন্যে উড়িবার স্বপ্ন

সকলের মধ্যে ঠিক একই আকারে দেখা যায় না। কেহ-বা দেখেন তিনি লাফাইয়া আকাশে উঠিতেছেন, আবার কেহ-বা দেখেন, তাঁহার শরীর সোলার মত হাল্‌কা হইয়াছে—তিনি পাখীর মত হু হু করিয়া উড়িয়া চলিয়াছেন, ইত্যাদি। মনোবিৎ পণ্ডিতেরা এই শ্রেণীর স্বপ্নের অর্থ সম্বন্ধে একমত নহেন। খুব সম্ভব, আকাশে উড়িবার স্বপ্ন সকল ক্ষেত্রে একই অর্থ নির্দ্দেশ করে না। এরূপ স্বপ্নের সঙ্গে প্রায়ই একটা আনন্দের ভাব মিশ্রিত থাকে। আমরা অনেক সময় খেলার ছলে ছোটছেলেকে শূন্যে ছুঁড়িয়া লুফিয়া থাকি। ছেলেরা ইহাতে বেশ আনন্দ পায়। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, শৈশবের এইরূপ খেলাধূলার আনন্দ-স্মৃতি প্রায়ই আকাশে উড়ার স্বপ্নের সহিত জড়িত। এই কারণে কেহ কেহ মনে করেন, আমাদের বাল্যজীবন

ফিরিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা, আকাশে উড়ার স্বপ্নে চরিতার্থ হয়। উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিরা প্রায়ই এই ধরণের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। স্বপ্নের ঘোরে জনসাধারণকে পশ্চাতে ফেলিয়া আকাশে উড়ায়, মনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কাল্পনিকভাবে পরিতৃপ্ত হয়। অন্যপক্ষে, অনেকে বলেন, কামজ-ইচ্ছা হইতেই এরূপ স্বপ্নের উৎপত্তি। অনেক সময় দেখা যায়, দোলনায় দোল খাইবার সময় ছোটছেলে বা বয়স্ক ব্যক্তিদের মনে কামভাবের সঞ্চার হয়। পূর্ব্বকালে বসন্তোৎসবে দোলনায় দোল খাওয়ার খুব প্রচলন ছিল। বসন্তোৎসবের অপর নাম মদনোৎসব। দোল খাইবার আনন্দ, ছুঁড়িয়া লোফায় ছেলেদের আনন্দ ও স্বপ্নঘোরে শূন্যে উড়িবার আনন্দ—সবই এক জাতীয়। আমি কতকগুলি আকাশে উড়ার স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া, সবগুলির মূলেই গুরুজনের প্রতি কামভাবের আভাস পাইয়াছি। ভাষার দিক দিয়া দেখিলেও, এরূপ স্বপ্নের মূলে যে কাম-ভাব আছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেমন, কাহারও চরিত্র-দোষ ঘটিলে আমরা চল্‌তি কথায় বলি, 'অমুক আজকাল উড়তে শিখেছে।'

উঁচু হইতে পড়ার স্বপ্ন

আকাশে উড়ার স্বপ্নে একটা আনন্দের ভাব থাকে, কিন্তু এই স্বপ্নে থাকে ভয়ের ভাব। এরূপ স্বপ্নের অর্থ লইয়াও মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন বানর ছিলেন, তখন গাছের উপরেই তাঁহারা বাস করিতেন। মাঝে মাঝে ঘুমন্ত অবস্থায় গাছ হইতে পড়িয়া তাঁহাদের কেহ কেহ পঞ্চত্ব পাইতেন ; কেহ কেহ বা মাটিতে পড়িয়া যাইবার পূর্ব্বেই গাছের ডালপালা আঁকড়িয়া আত্মরক্ষা করিতেন। আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে এরূপ অব্যাহতি পাওয়া বড়-একটা যা-তা ব্যাপার নহে। তাই এই ঘটনা তাঁহাদের মনে দৃঢ় রেখাপাত করিত। এই বানরের বংশধরদের, অর্থাৎ আমাদের, মনে বংশ-পরম্পরা হইতে সেই পতনের ধারণা চলিয়া আসিয়াছে। এই কারণে আমরা ঘুমের ঘোরে উঁচু হইতে নীচে পড়িয়া যাইতেছি, এইরূপ স্বপ্ন দেখি ; কিন্তু কখনই মৃত্তিকা স্পর্শ করি না। স্বপ্নের এরূপ ব্যাখ্যা জীববিদ্যামূলক (biological)—মনোবিদ্যায় ইহার বিশেষ মূল্য নাই। কেহ কেহ বলেন, নিদ্রাকালে পা দুইটি একটু সরিয়া গেলেই না-কি আমরা উঁচু হইতে পড়িয়া যাওয়ার স্বপ্ন দেখি। এ ব্যাখ্যাও

মনোবিদ্যা-সম্মত নহে। অনেক মনোবিদের মতে, স্বপ্নে উঁচু হইতে পড়া—নৈতিক-পতনের প্রতীক। আমাদের প্রত্যেকের মনেই নানা গর্হিত কাজের ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। উঁচু হইতে পড়িয়া যাওয়ার স্বপ্নে অধঃপতনের ইচ্ছাই কাল্পনিকভাবে পরিতৃপ্ত হয়।

নগ্ন অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ানো

এই স্বপ্নের নানা প্রকার-ভেদ আছে। অবিকৃত অবস্থায় স্বপ্নটি এইরূপ :—'স্বপ্নদ্রষ্টা উলঙ্গ রহিয়াছেন ; ইহাতে তিনি বিশেষ লজ্জিত। কিন্তু নগ্নতা ঢাকিবার কোনও উপায় নাই। লোকজনের মধ্যে তিনি ঘুরিতেছেন, অথবা তাঁহার চারিপাশে লোকজন রহিয়াছে।' এরূপ স্বপ্নের বিশেষত্ব এই, স্বপ্নদ্রষ্টা নগ্নতার জন্য নিজে লজ্জিত বটে, কিন্তু অন্যলোক তাঁহার উলঙ্গ অবস্থা গ্রাহ্যই করিতেছে না। কেহ-বা এই স্বপ্ন একটু অন্য রকম ভাবে দেখেন। স্বপ্নদ্রষ্টার বস্ত্রাদি অসম্বৃত ; এই অবস্থায় তাঁহাকে অপরের সাম্‌নে বাহির হইতে হইয়াছে। অথবা, যে-পোষাকে যেখানে যাওয়া উচিত নয়, সেই পোষাকেই তিনি যেন সেখানে গিয়াছেন। ফ্রয়েড বলেন, এই শ্রেণীর স্বপ্ন দেখেন না, এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু আমার ত মনে হয়

বিলাতের তুলনায় এদেশের বড় বেশী লোক এরূপ স্বপ্ন প্রায় দেখেন না। এই শ্রেণীর স্বপ্নের উৎপত্তি—নিজ রূপ দেখাইবার ইচ্ছা হইতে। শিশুরা স্বভাবতঃ উলঙ্গ থাকিতে ভালবাসে। সমাজ ও শিক্ষার গুণে ক্রমে এই নগ্নতা তাহাদের মনে একটা লজ্জার ভাব আনিয়া দেয়। স্বপ্নে উলঙ্গ হওয়ার অর্থ এই, আমরা যেন বাল্যকালের সেই অসঙ্কোচ নগ্নতা ফিরিয়া পাইতে চাই। এই কারণে স্বপ্ন-দৃষ্ট অন্যান্য লোকজন, অর্থাৎ গুরুজনেরা, স্বপ্নদ্রষ্টার উলঙ্গ অবস্থা গ্রাহ্যই করিতেছেন না। বিলাতের তুলনায় আমাদের দেশে নিজ রূপ দেখাইবার সুযোগ বেশী বলিয়াই, এই ইচ্ছার রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কম।

দাঁত-তোলার স্বপ্ন

এই স্বপ্নও বিলাতের তুলনায় আমাদের দেশে কম লোকেই দেখেন বলিয়া মনে হয়। স্বপ্নদ্রষ্টা নিজের দাঁত তুলিয়া ফেলিতেছেন, বা অপর কেহ তাঁহার দাঁত তুলিয়া দিতেছে, অথবা আপনা হইতেই দাঁত পড়িয়া গেল। ফ্রয়েড বলেন, এই শ্রেণীর স্বপ্নের উৎপত্তি অযোনিজ কাম-ইচ্ছা হইতে। স্ত্রীলোকের পক্ষে কিন্তু এরূপ স্বপ্নে সন্তানলাভের ইচ্ছাই সূচিত হয়।

পড়া তৈয়ারী হয় নাই, অথচ পরীক্ষা দিতে হইবে

ফ্রয়েড বলেন, যাঁহারা পূর্ব্বে পরীক্ষায় ফেল হইয়াছেন, তাঁহারা এ স্বপ্ন দেখেন না। তাঁহার মতে, হাতে কোন কঠিন কাজ থাকিলেই আমরা এরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। এই স্বপ্নের উদ্দেশ্য—স্বপ্নদ্রষ্টা নিজেই নিজেকে আশ্বাস দিতেছেন, 'মন! আগে-আগেও পরীক্ষার সময় যেমন তুমি অনর্থক চিন্তিত হইয়াছিলে, এবারও তেমনি মিছাই চিন্তিত হইতেছে।' স্বপ্নে করণীয় কর্ম্মের সাফল্যের ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। আমি কিন্তু এই-প্রকার স্বপ্নের অর্থ সম্বন্ধে ফ্রয়েডের সহিত সম্পূর্ণ একমত নহি। আমি অনেককে জানি যাঁহারা পরীক্ষায় ফেল হইলেও এরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। সুতরাং কার্য্যের সাফল্যের ইঙ্গিতই এই ধরণের সকল স্বপ্নেই থাকিবে, এমন কথা নাই। শীতের রাত্রে নিদ্রাকালে মূত্রত্যাগের বেগ হইলে, বিছানা ছাড়িয়া উঠিব, না নিদ্রা যাইব, অনেক সময় মনে এই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। ইহাতে অশান্তি ঘটে। মূত্রত্যাগ আবশ্যক, অথচ করা যাইতেছে না, এই ভাবটাই স্বপ্নে প্রকাশ পায়—পরীক্ষা দিতে হইবে, অথচ পড়া তৈয়ারী নাই। শারীরিক বৃত্তিগত ইচ্ছাই এই স্বপ্নের মূল

কারণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু আমি এরূপ ইচ্ছার সহিত কাম-ইচ্ছাও জড়িত থাকিতে দেখিয়াছি। ট্রেন ফেল হওয়ার স্বপ্নের অর্থও পূর্ব্বানুরূপ।

চোর ডাকাত ও হিংস্র জন্তুর স্বপ্ন

বিশ্লেষণ করিলে চোর-দেখার স্বপ্নের মূলে পিতার প্রতি বৈরীভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। স্বপ্নে ডাকাতের আক্রমণের অর্থ—কামজ আক্রমণ। হিংস্র জন্তুতে তাড়া করার অর্থও তাই। পুরুষের পক্ষে কিন্তু সমকামিতা এরূপ স্বপ্নের মূল কারণ।

জলে-ডোবা বা জল হইতে তোলার স্বপ্ন

এই স্বপ্নের অর্থ সন্তানলাভের ইচ্ছা। আশ্চর্য্য এই—পুরাণে, গল্পে, উপকথায় স্বপ্নের অর্থ অজ্ঞাতসারে প্রকাশিত হয়। পৌরাণিক উপকথায় দেখা যায়, অনেক নায়কেরই উৎপত্তি জল হইতে; যেমন, কর্ণ। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারায়' রাজপুত্রকে জলের ধারেই পাওয়া গিয়াছিল।

প্রিয়পরিজনের মৃত্যু-স্বপ্ন

আমরা প্রায় সকলেই সময়ে-সময়ে নিকট-আত্মীয়ের মৃত্যু-স্বপ্ন দেখি। ফ্রয়েড এরূপ স্বপ্নের বিশদ আলোচনা

করিয়াছেন। এই স্বপ্নগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) স্বপ্নে পিতামাতা বা অপর কোন আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটিল, কিন্তু এই দুর্ঘটনায় স্বপ্নদ্রষ্টার মনে একটুও শোক-দুঃখের সঞ্চার হইল না। (২) আত্মীয়-বিয়োগের স্বপ্ন দেখিয়া মনে দারুণ শোক ও দুশ্চিন্তার উদয় হইল ; এমন কি ঘুম ভাঙ্গিবার পরও কিছুক্ষণ মনটা খারাপ হইয়া রহিল।

প্রথম শ্রেণীর স্বপ্নে বাস্তবিকপক্ষে কোন মৃত্যু-ইচ্ছা থাকে না। লোক-বিশেষের পক্ষে এরূপ স্বপ্নের অর্থ নানারূপ হইতে পারে। ফ্রয়েড একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়াছেন। 'একটি স্ত্রীলোক স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার ভগিনীর ছেলেটি মরিয়া রহিয়াছে, তাহাকে শবাধারে শোয়ানো হইয়াছে।' স্বপ্নটিতে কিন্তু কোনরূপ দুঃখের ভাব ছিল না। বিশ্লেষণে দেখা গেল, কিছুদিন পূর্ব্বে সেই ভগিনীর আরও একটি সন্তান যখন মারা যায়, তখন বাটীতে বহু আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের সমাগম হয়। এই-সব লোকের মধ্যে উক্ত স্বপ্নদর্শনকারিণীর প্রণয়ীও উপস্থিত ছিল। এই ঘটনার পর প্রণয়ীর সহিত অনেকদিন তাঁহার আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। বাড়ীতে মৃত্যু-উপলক্ষে প্রেমাস্পদকে দেখিবার একবার

যেমন সুযোগ ঘটিয়াছিল, পুনরায় তেমনি আর কাহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিবে, এই ইচ্ছাই উক্ত স্বপ্নের আকারে ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। স্বপ্নের উদ্দেশ্য বালকের মৃত্যু নয়—প্রণয়ীর সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা। যে মৃত্যু-স্বপ্নে দুঃখের ভাব জড়িত, তাহারই মূলে মৃত্যু-কামনা বর্ত্তমান থাকে। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, জ্ঞানতঃ যাহাকে ভালবাসিতেছি, ভিতরে তাহার প্রতি বৈরীভাব থাকা সম্ভব কি? স্বপ্নে যে-সকল রুদ্ধ ইচ্ছা চরিতার্থতালাভের চেষ্টা করে, তাহাদের অনেকগুলিই যে শৈশবাবস্থার ইচ্ছা—একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আত্মীয়স্বজনের প্রতি শত্রুভাবের উৎপত্তিও শৈশবে। বাল্যকালে ভাই-বোনের মধ্যে হিংসার ভাব স্বাভাবিক; বালক-বালিকাদিগকে লক্ষ্য করিলেই একথা বুঝা যাইবে। আমরা অনেকেই মনে করি, মানুষের জীবনে শৈশবকালই সর্ব্বাপেক্ষা মধুর, এহেন সোনার শৈশবে বুঝি হিংসাদ্বেষ ও স্বার্থের কলকোলাহল নাই। কিন্তু শিশুর মন যে কত কুটিল হইতে পারে, তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। কেহ কেহ এই কুটিলতা দেখিয়াও দেখেন না, ছেলে-খেলা বলিয়া উড়াইয়া দেন। শিশু নিজ সুখের

সন্ধানেই ব্যস্ত। তাহার আদর-যত্ন বা খেলনা প্রভৃতির ভাগীদার জুটিলে সে ভারি বিরক্ত হয়। এই কারণে সে ভাই-বোনের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। পিঠোপিঠি ভায়ে-ভায়ে, বা বোনে-বোনে ঝগড়ার কথা সকলেই জানেন। আমি এমন শিশুও দেখিয়াছি, যে তাহার নবজাত ভাইটিকে গলা টিপিয়া মারিতে উদ্যত হইয়াছে। শিশুর পক্ষে মৃত্যু-সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। তাহার নিকট মৃত্যুর অর্থ—স্থানান্তরে যাওয়া মাত্র। বাড়ীতে কাহারও মৃত্যু হইলে শিশুকে বুঝান হয় যে, মৃতব্যক্তি স্বর্গে গিয়াছে। শিশুর নিকট স্বর্গ একটি ভিন্ন দেশমাত্র। এইজন্য তাহার পক্ষে ভাই-বোনের মৃত্যু-কামনার উদ্দেশ্য—তাহাদিগকে অন্যত্র সরাইয়া দেওয়া হইতে পারে। শিশুর মনে কেবল যে ক্রূরভাব থাকে, একথা বলিতেছি না। শিক্ষা, শাসন ও স্বভাবের ফলে তাহার মনে ভালবাসা ইত্যাদি সদ্‌গুণেরও উন্মেষ হয়। কিন্তু কাহারও প্রতি বৈরীভাব এবং প্রীতি একই সময়ে থাকা অসম্ভব। এইজন্য শৈশবে ভাই-বোনে যে বিরোধের ভাব থাকে, তাহা ভালবাসার পরিপন্থী বলিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের মনের অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া যায়। কিন্তু এই

বৈরীভাব জ্ঞানের অগোচর হয় বলিয়াই যে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা নয়—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও অনুকূল ঘটনায় তাহা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। ভায়ে-ভায়ে বিরোধ যে কত উৎকট হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বাহিরের মনে ভালবাসা, অথচ ভিতরের মনে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে বৈরীভাব থাকা বিচিত্র নয়। এই বৈরীভাবই প্রহরীর চোখে ধূলি দিয়া, স্বপ্নে আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু-কামনারূপে প্রকাশ পায়। চেতনায় কিন্তু আমরা দেখি, আত্মীয়স্বজনের প্রতি ভালবাসার ইচ্ছাই রহিয়াছে। স্বপ্নের মৃত্যু-কামনা এই ভালবাসার বিরোধী বলিয়া, মনে এত কষ্ট হয়।

বাপ-মায়ের প্রতি ছেলেমেয়ের কিরূপ ভাব থাকিতে পারে, সে-সম্বন্ধেও আলোচনা আবশ্যক। অনেকেই হয় ত লক্ষ্য করিয়াছেন, ছেলে মাকে, এবং মেয়ে বাপকে বেশী ভালবাসে। অতি অল্প বয়সেই এই ঐতর-কামিতার আভাস পাওয়া যায়। বাপ, মায়ের ভালবাসার অংশী বলিয়া ছেলে বাপের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। সেইরূপ মা, বাপের ভালবাসার ভাগীদার বলিয়া মেয়ে মাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখে। পিতামাতার মৃত্যু-স্বপ্ন আলোচনা করিলে তাহার একটি বিশেষত্ব সহজেই

আমাদের নজরে পড়ে। ছেলেরাই বাপের, আর মেয়েরাই মায়ের মৃত্যু-স্বপ্ন বেশী দেখে। ছেলের পক্ষে মায়ের, অথবা মেয়ের পক্ষে বাপের মৃত্যু-স্বপ্ন অতি বিরল। অনেক সময় মনের প্রহরী সজাগ থাকে বলিয়াই বাপ-মায়ের মৃত্যু-স্বপ্ন সোজাসুজি দেখা দেয় না। যেমন, "ক"-বাবু তাঁহার বাপের মৃত্যু-স্বপ্ন অবিকৃত অবস্থায় দেখেন নাই। আমার এক রোগী একবার স্বপ্ন দেখেন, তিনি যেন খালি পায়ে গায়ে চাদর দিয়া বেড়াইতেছেন। অবাধ-অনুষঙ্গ-ক্রমের সাহায্যে স্বপ্নটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল—ইহা অশৌচের চিহ্ন। তিনিও পিতার মৃত্যু-কামনা করিয়াছেন। অনেক সময় পিতা-মাতার পরিবর্ত্তে আমরা অন্যান্য গুরুজনেরও মৃত্যু-স্বপ্ন দেখি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মৃত্যু-দর্শন মূলতঃ পিতা-মাতার মৃত্যু-কামনারই রূপান্তর।

স্বপ্ন-প্রতীক

স্বপ্নে অনেক জিনিষই সোজাসুজি স্বরূপে দেখা না দিয়া প্রতীক (symbol) রূপে দেখা দেয়, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই প্রতীকের অর্থ সহজে ধরিবার যো নাই বলিয়া প্রতীক সহজেই মনের প্রহরীকে এড়াইতে পারে। প্রতীকের অর্থ নির্দ্ধারণ করা সোজা কাজ নহে। কোন-একটি স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া এই অর্থ-নির্ণয় অসম্ভব। বহু স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিলেও অনেক সময় প্রতীকের যথার্থ অর্থ বাহির করিতে পারা যায় না। ভাষাতত্ত্ব, পুরাণ, প্রবাদ-বাক্য ইত্যাদির আলোচনা দ্বারা প্রতীকের অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে হয়। প্রতীক সার্ব্বজনীন; প্রতীকের অর্থের বড়-একটা তারতম্য হয় না; সকলের স্বপ্নেই একই প্রতীক একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই নিয়মের যে একেবারেই ব্যতিক্রম হয় না, একথা অবশ্য বলা চলে না। সেইজন্য কেবল প্রতীকের অর্থ ধরিয়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া নিরাপদ নহে। ফ্রয়েড বলেন, প্রতীকের ধারণা কোন ব্যক্তি-বিশেষের অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ নহে।

মনে করুন, আমি কখনও দেহতত্ত্বের গান শুনি নাই, অথবা দেহের সহিত গৃহের যে কোন সাদৃশ্য থাকিতে পারে, তাহাও কোনদিন আমার মনে হয় নাই। এরূপ অবস্থায় স্বপ্নে আমি গৃহ দেখিলাম। এখানেও গৃহের অর্থ—দেহ। এই দেহ ও গৃহের সাদৃশ্য আমার মনে কোনদিন উদিত না হইলেও কি করিয়া যে গৃহ দেহের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইল, তাহা বুঝা দুষ্কর। ফ্রয়েড বলেন, প্রতীক সহজ সংস্কারের ন্যায় মানুষের মনে স্বতঃই স্ফূর্ত্ত হইয়া থাকে। আমি এই ব্যাখ্যার অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ মনোজগতে জীববিদ্যামূলক ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। কি করিয়া যে সকলেই একই প্রতীক কোন-একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন, তাহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার—এখনও ইহার সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। বর্ব্বর ও আদিম অধিবাসীদের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাদের চিন্তা-ধারার সহিত সভ্যজাতির চিন্তাধারার একটু প্রভেদ আছে। আদিম জাতি রূপক বা প্রতীকের সাহায্যেই অনেক বিষয়ের চিন্তা করিয়া থাকে। শিশুদের চিন্তাতেও রূপকের প্রভাব বেশী। স্বপ্ন-দেখার সময় আমাদের মনের অবস্থা অনেক বিষয়েই শিশুদের

মত হইয়া পড়ে। এইজন্য শিশুর চিন্তাধারার বিশেষত্বগুলি আমাদের স্বপ্নের মধ্যে প্রকাশ পায়। স্বপ্নে প্রতীকের বহু আবির্ভাবের ইহাও এক কারণ।

রূপক ও প্রতীকে কিছু প্রভেদ আছে। দেহতত্ত্বের গানে যখন আত্মাকে পাখী, বা দেহকে পিঞ্জর বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তখন তাহা রূপক মাত্র। এই রূপকের অর্থ আমাদের নিকট অজ্ঞাত নহে। কিন্তু যদি কেহ সাপের উপাসনা করেন, অথচ কেন যে সাপকে দেবতা ভাবিতেছেন তাহা যদি তাঁহার জানা না থাকে, তবেই সাপকে প্রতীক বলা চলে। অবশ্য সকল প্রতীকেরই আমরা একটা মন-গড়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। প্রতীকের বিশেষত্বই এই, তাহার প্রকৃত অর্থ বলিয়া দিলেও মন তাহা মানিতে চায় না। মনোবিদেরা স্থির করিয়াছেন, সাপ পুং-লিঙ্গের প্রতীক। স্বপ্নে সাপ এই অর্থেই প্রকাশ পায়। প্রতীকের অর্থ ধরা পড়িলে দেখা যাইবে, প্রকৃতপক্ষে প্রতীক যে বস্তু নির্দ্দেশ করিতেছে, সেই বস্তুর সহিত তাহার অনেক বিষয়েই মিল আছে। রাজা—পিতার প্রতীক। রাজার কাজ —শাসন ও পালন। পিতার কাজও তাই। রাজা ও পিতা উভয়েই অপরাধের দণ্ড দেন ; উভয়েই ভক্তি-

শ্রদ্ধার পাত্র। সাধারণের পক্ষে রাজার রাজৈশ্বর্য্য যেমন কাম্য, বালকের পক্ষেও পিতার গুণাবলীও সেইরূপ আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী, ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে রূপক ও প্রতীকের তারতম্য ধরা কঠিন। স্বপ্নে রূপক ও প্রতীক দুই-ই দেখা যায়। প্রতীকের অর্থ জানা থাকিলে স্বপ্ন বিশ্লেষণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া পড়ে। স্বপ্নে যে-সকল প্রতীক সচরাচর প্রকাশ পায়, এখানে সে-সকলের অর্থ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

স্বপ্নে রাজা, শাসনকর্ত্তা, পুলিস ইত্যাদি পিতার প্রতীক। সেইরূপ রাণী—মাতার প্রতীক। রাজপুত্র—স্বপ্নদ্রষ্টা স্বয়ং। ছড়ি, লাঠি, ছাতা, সাপ প্রভৃতি দীর্ঘবস্তু—পুং-জনন-ইন্দ্রিয় নির্দ্দেশ করে। বাক্স, পেঁটরা প্রভৃতি—স্ত্রী-জনন-ইন্দ্রিয়জ্ঞাপক। গৃহ—শরীরের প্রতীক। মসৃণ প্রাচীর-বিশিষ্ট গৃহ—পুরুষ-দেহব্যঞ্জক। আলিসা-সংযুক্ত বা বন্ধুর প্রাচীর-বিশিষ্ট গৃহ—স্ত্রী-শরীরকে বুঝায়। পক্ষী, মৎস্য ইত্যাদি পুং-জনন-ইন্দ্রিয়জ্ঞাপক। জটিল যন্ত্রাদি স্ত্রী-চিহ্নের প্রতীক। প্রাকৃতিক দৃশ্য—কখন-বা পুং-চিহ্ন, কখন-বা স্ত্রী-চিহ্ন জ্ঞাপন করে। শ্রেণীবদ্ধ পরস্পর দ্বার-সংযুক্ত গৃহ, অর্থাৎ যাহার একটির ভিতর দিয়া অপরটিতে যাওয়া যায়—চরিত্র-হীনতার

ইঙ্গিত করে। সিঁড়িতে উঠা বা নামা—রতি-ক্রিয়ার প্রতীক। জল—সন্তান-জন্মের সূচনা করে। অগ্নিও খুব সম্ভব তাই। চরকা, মাকড়সা ইত্যাদি—মাতার প্রতীক। নূন, বিষ, ঔষধ ইত্যাদি অনেক সময়েই শুক্রের প্রতীক। ক্ষত—স্ত্রী-চিহ্ন জ্ঞাপক। অঙ্গুরীও তাহাই। স্বপ্নে জনতা—স্বপ্নদ্রষ্টার গুহ্যভাব বা গুহ্যকথার নির্দ্দেশ করে।

স্বপ্নে একাধিক ব্যক্তির সমাবেশ থাকিলে, তাহার মধ্যে কোন্‌টি স্বপ্নদ্রষ্টা, তাহা অনেক সময় নির্ণয় করা কঠিন। এরূপ স্থলে যিনি নায়ক, বা যাঁহার মনে সুখ-দুঃখ হর্ষ-বিষাদ ইত্যাদির তরঙ্গ উঠিতেছে, তিনিই স্বপ্নদ্রষ্টা। এখানে বলা আবশ্যক, স্বপ্ন ego-centric অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক। স্বপ্নে দ্রষ্টা স্বয়ং কোন-না-কোন মূর্ত্তিতে নিশ্চয়ই আছেন। নিছক অপরের ব্যাপার-সংক্রান্ত স্বপ্ন আমরা কখনও দেখি না। অনেক সময় যে ভাব বা যে বস্তু স্বপ্নের মূলে নিহিত, তাহা স্বপ্নে সম্পূর্ণ প্রকাশ না পাইয়া তৎসংক্রান্ত কোন-একটা ভাবের অংশ-বিশেষের আভাস থাকে মাত্র। এগুলি ঠিক প্রতীক না হইলেও অনেকটা প্রতীকের মতই বটে। "ক"-বাবুর স্বপ্নে ভাঙ্গা দেওয়ালের সহিত কবরের চিন্তার সংযোগ ছিল। সুতরাং স্বপ্নটিতে ভাঙ্গা দেওয়াল কবরের প্রতীকের অনুরূপ।

স্বপ্নে অতিপ্রাকৃত বিষয়

স্বপ্নে অতিপ্রাকৃত ঘটনার আভাস পাওয়া যায় কিনা, তাহা জানিতে সাধারণের কৌতূহল আছে। কারণ, অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি আমাদের প্রবল। এই হেতু সময়-সময় আমরা অতি সামান্য প্রমাণেই অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করিয়া বসি। কোন ঘটনার সত্যাসত্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে হইলে সতর্কতা আবশ্যক। অনেকেই হয় ত স্বপ্নদৃষ্ট নানা অলৌকিক ঘটনার উদাহরণ দিতে পারেন। কিন্তু সেগুলি ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে যে, তাহার অধিকাংশই বিজ্ঞানের হিসাবে গ্রাহ্য নহে। মনে করুন, আমি ভূত বিশ্বাস করি। অন্ধকার রাত্রে গাছের গুঁড়ি দেখিয়া ভয় পাইলাম; বৈঠকখানায় আসিয়া বন্ধুবান্ধবদের বলিলাম, 'এইমাত্র স্বচক্ষে ভূত দেখিয়াছি।' এখানে জ্ঞানতঃ মিথ্যা না বলিলেও আমার কথা প্রামাণ্য নহে। ভূতে বিশ্বাস হেতু আমার পর্য্যবেক্ষণে ভুল হইল। রুদ্ধ ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা কেমন করিয়া ভুল করি, সে কথা ১৩২৮

সালের 'ভারতবর্ষের' ভাদ্র সংখ্যায় 'কারণ-তত্ত্ব' প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। স্বপ্নে অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছার প্রভাব বেশী; তাই স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা বর্ণনা করিবার সময় ভুল হইবার সম্ভাবনাও বেশী। আরও অনেক কারণে অলৌকিক ঘটনার বর্ণনায় ভুল হইতে পারে। ইচ্ছাকৃত মিথ্যা-বর্ণনার আলোচনা করিতে চাই না; এ কথা কিন্তু জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, অলৌকিক ঘটনা বর্ণনাকালে অতিরঞ্জনের প্রয়াস প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। স্বপ্নদৃষ্ট কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, সেগুলি অতিপ্রাকৃত কিনা, পাঠক বিচার করিবেন।

কেহ কেহ স্বপ্নে এমন ঘটনা দেখেন, যাহা বহুপূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে; কিন্তু স্বপ্ন-দ্রষ্টার পক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই ধরণের স্বপ্ন আমি নিজে কখনও দেখি নাই, কিংবা এরূপ স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিবার সুযোগও আমার ঘটে নাই। এরূপ স্বপ্ন দেখা সম্ভব কি না, তাহাও জোর করিয়া বলিতে পারি না। তবে, স্বপ্নদৃষ্ট অলৌকিক ঘটনা পরীক্ষা করিতে হইলে কি কি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত, তাহা এখানে নির্দ্দেশ করিতেছি। নিতান্ত শৈশবাবস্থার অনেক

ঘটনা স্মৃতি হইতে একেবারে মুছিয়া গেলেও মনের অজ্ঞাত প্রদেশে তাহাদের অবস্থিতি অসম্ভব নহে এবং স্বপ্ন দেখিবার সময় শৈশবের অন্যান্য ঘটনার সহিত জড়িত হইয়া সেগুলি আমাদের স্মৃতিপথে আসিতে পারে। এক হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোক ফিটের সময় বিশুদ্ধ হিব্রু অনর্গল উচ্চারণ করিত, অথচ সুস্থ অবস্থায় তাহার হিব্রুভাষা-জ্ঞানের কোনও লক্ষণ কখনও দেখা যায় নাই। অতএব ঘটনাটিকে 'ভূতাবেশ' বলিয়া অনেকে মনে করিলেন। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেল, শৈশবে স্ত্রীলোকটি এক পাদ্রীর ঘরে প্রতিপালিত হয়। পাদ্রী প্রত্যহ প্রাতে উচ্চৈঃস্বরে হিব্রুভাষায় বাইবেল পাঠ করিতেন। স্ত্রীলোকটির সেই শৈশব-স্মৃতি মন হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত হয় নাই। সুস্থ অবস্থায় তাহার স্মৃতির পরিচয় পাওয়া যাইত না, মূর্চ্ছার সময় প্রকাশিত হইত। একবার আমি এক 'ভূতে-পাওয়া' রোগিনীর চিকিৎসা করিতে যাই। মেয়েটি অল্পবয়স্কা, ফিটের সময় 'বক্তার' হইত। বক্তার হইবার মুখে সে বলিতে লাগিল, তাহার নাম অমুক, তাহার গ্রাম অমুক ইত্যাদি; স্বামীর সহিত কলহের ফলে সে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করে; এই রোগিনীকে অশুচি অবস্থায়

পাইয়া তাহার উপর ভর করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, রোগিনীর পিতা Postal Guide দেখিয়া সেই গ্রামের সন্ধান পান এবং তথাকার পোষ্টমাষ্টারকে লিখিয়া সংবাদ পান যে, চার-পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সেই গ্রামে সত্যসত্যই ঐ নামের এক স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত ঝগড়া করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। রোগিনীর পক্ষে সেই আত্মঘাতিনীর নামধাম জানার সম্ভাবনা ছিল না; তাই 'ভূতাবেশ' বলিয়া রোজার দ্বারা প্রথমে ইহার চিকিৎসা হইয়াছিল। রোগিনীর এক আত্মীয় ভূতে অগাধ বিশ্বাসী; তিনি আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যদি ইহা হিষ্টিরিয়া বলেন, তবে এই-সকল আশ্চর্য্য ঘটনা কিরূপে ঘটিল?" আমি রোগিনীকে সুস্থ অবস্থায় অনেকবার প্রশ্ন করিয়াও কিছুই ধরিতে পারি নাই। সত্য কথা বলিতে কি, অনেকদিন পর্য্যন্ত আমি এই ব্যাপারের প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারি নাই। হঠাৎ একদিন রোগিনীর ফিটের সময় উপস্থিত হই। ফিট না-ছাড়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিলাম। ঘরের দেওয়াল-আলমারীর একটি তাকে 'বঙ্গবাসীর' কতকগুলি পুরাতন সংখ্যা ছিল। সময় কাটাইবার জন্য সেগুলি উল্‌টাইতেছি, এমন সময়

রোগিনীর মুখে শোনা সেই গ্রামটির উল্লেখ দৈবাৎ দেখিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইলাম। পাঠ করিয়া দেখি, 'বঙ্গবাসীর' সংবাদ-দাতা লিখিতেছেন যে, "অমুক নাম্নী স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত কলহ করিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছে।" এইটুকু পড়িবামাত্র সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগিনী কোন-না-কোন সময়ে সেই সংবাদ পাঠ করিয়াছে, আর অজ্ঞাতসারে ঘটনাটি তাহার মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ফিটের সময় কল্পনায় সে নিজেকে ঐ আত্মঘাতিনীর প্রেতাত্মা দ্বারা অভিভূত মনে করে। ফিট ছাড়িয়া গেলে, রোগিনীকে 'বঙ্গবাসী'-খানি দেখাইলাম। তাহার পর আর কখনও তাহার ফিট হয় নাই। দৈবক্রমে কাগজখানি হস্তগত হইয়াছিল বলিয়াই প্রকৃত রহস্য প্রকাশ পাইল, নতুবা অন্য কোন প্রকারে ঘটনার সঠিক তথ্য নির্ণীত হইত কিনা সন্দেহ।

পাঠক দেখিলেন, কোন ঘটনার সন্তোষজনক কারণ দিতে না পারিলেই যে তাহাকে অলৌকিক বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে, এমন-কোন কথা নাই। উপরিলিখিত দুইটি ঘটনার মূলে স্মৃতিরোধ বর্ত্তমান। অতীত ঘটনা স্বাভাবিক অবস্থায় মনে না পড়ায়,

আপাতদৃষ্টিতে দুইটি রোগীরই আচরণকে অলৌকিক ঘটনা বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল।

আরও এক প্রকার স্মৃতি-বিভ্রম দেখা যায়। ইংরেজীতে ইহাকে বলে—Paramnesia. এরূপ স্মৃতি-বিভ্রমের ফলে যে-বিষয় বা যে-ঘটনা প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বপ্রথম দেখিতেছি বা শুনিতেছি, তাহা যেন আর কখনও দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয়। মনে করুন, এক ব্যক্তি পূর্ব্বে কখনও বিলাত যান নাই। কিন্তু প্রথমেই লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে নামিয়া তাঁহার মনে হইল, এ স্থান যেন তিনি আর কখনও দেখিয়াছেন। এইরূপ স্মৃতি-বিভ্রম কেন হয়, সে-সম্বন্ধে Bergson-প্রমুখ বড় বড় মনোবিৎ বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। সকল-প্রকার Paramnesiaর তথ্য এখনও নির্ণীত হয় নাই। এখানে আমার নিজের মত ব্যক্ত করিব।

ধরুন, আমি রবিবার বৈকালে যাদুঘর দেখিতে গিয়াছিলাম। পরদিন এই ঘটনার স্মৃতি আমার মনে উঠিল। কেবল যে যাদুঘর-দর্শনরূপ ঘটনাই আমার স্মৃতিপথে উঠিল, তাহা নহে। কোন্ স্থানে ও কোন্ সময়ে যাদুঘর দেখিয়াছি, তাহাও আমার মনে পড়িয়া

গেল। অতএব দেখা গেল, স্মৃতিতে অতীত ঘটনা ব্যতীত স্থান-কালেরও নির্দ্দেশ থাকে। আর একটা উদাহরণ দিই। অনেকদিন পরে কোন পরিচিত বন্ধুকে দেখিলাম। বন্ধুর পূর্ব্বেকার মূর্ত্তি মনে উঠিল, আর সেই মূর্ত্তিই যে আমার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া, তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু সময়-সময় এমনও হয় যে, কাহাকেও দেখিয়া পরিচিত লোক বলিয়া বোধ হইল, অথচ তিনি কে, কোথায় তাঁহাকে দেখিয়াছি, কিছুই মনে আসিল না। এরূপ অবস্থায় স্মৃতিতে স্থান ও কাল-নির্দ্দেশে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। তবে তিনি যে পরিচিত, এই ভাবটি এখনও মনে আছে। তিনি কে, হঠাৎ মনে পড়িল; অর্থাৎ পূর্ব্ব-পরিচয়ের সহিত স্থান ও কাল-নির্দ্দেশের সংযোগ ঘটিল।

সাধারণের ধারণা, কালের ব্যবধানের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির বিকৃতি ঘটে। পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তি কে, কোথায় তাঁহাকে দেখিয়াছি, একথা প্রথমে আমরা ভুলিয়া যাই; ক্রমে তাঁহার মূর্ত্তিও স্মৃতিপথ হইতে লুপ্ত হইয়া যায়; তখন তাঁহাকে পুনরায় দেখিলে, আর কখনও যে তাঁহাকে দেখিয়াছি তাহা মনে পড়ে না। কিন্তু এই স্মৃতির বিলোপ যে কেবল কালের ব্যবধানেই সম্ভব তাহা নহে—নানা মানসিক কারণেও এরূপ ঘটিতে

পারে। আজ যাঁহার সহিত পরিচিত, কাল তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতে পারি। কেহ কেহ অতি শীঘ্র নাম ভুলিয়া যান, কেহ-বা চেহারা ভুলিয়া যান—ইত্যাদি। আমি অতি নিবিষ্টচিত্তে কোন কাজে ব্যাপৃত আছি। আমার পাশে বসিয়া দুই ব্যক্তি কথোপকথন করিতেছেন। তাঁহাদের কথা আমার কানে আসিলেও আমার মন কিন্তু সেদিকে নাই। মনে করুন, আমার অজানা কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে তাঁহাদের কথা হইতেছে; আর এই অজানা লোকটির নামও কিছু অদ্ভুত রকমের, যেমন, সোমসুন্দর। কিছুক্ষণ পরে অপর এক ব্যক্তি আসিয়া যদি 'সোমসুন্দর' নাম উচ্চারণ করেন, তবে আমার মনে হইবে, নামটি যেন আমার পরিচিত, অথচ কোথায় এই নাম শুনিয়াছি তাহা স্মরণ করিতে পারিব না। সেইরূপ অন্যমনস্ক অবস্থায় যদি আমরা কিছু প্রত্যক্ষ করি, আর পরে যদি তাহা পুনরায় আমাদের নয়ন বা শ্রুতিগোচর হয়, তবে তাহা আমার নিকট পরিচিত বলিয়া মনে হইবে, অথচ পূর্ব্বে আর কোথায় দেখিয়াছি, তাহা না-ও মনে পড়িতে পারে। উপরের উদাহরণগুলিতে প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার দেখা বা শোনার মধ্যে কালের ব্যবধান আছে। কোন বিষয় অন্যমনস্ক

হইয়া দেখিলে, তাহার প্রথম-দর্শনের স্মৃতি তৎক্ষণাৎ মন হইতে লুপ্ত হইতে পারে, এবং পর মুহূর্ত্তেই সেই বিষয় পূর্ব্বে আর কোথাও দেখিয়াছি মনে হওয়া অসম্ভব নহে। এখন প্রথম উদাহরণ দেখি। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অবস্থায়, নানা মানসিক উদ্বেগের মধ্যে প্রথমে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে নামিলাম। ষ্টেশনের প্রথম স্মৃতির ছাপটি সঙ্গে সঙ্গে মন হইতে মুছিয়া গেল। সেইজন্য পর মুহূর্ত্তেই মনে হইল, বুঝি বা ইহা আর কখনও দেখিয়াছি। এইরূপে Paramnesia বা স্মৃতি-বিভ্রমের উৎপত্তি হয়। এইজন্য কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া পরে কেহ যদি বলেন যে, তিনি তাহা পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, তবে সে কথায় আস্থা স্থাপন করা যায় না।

অজ্ঞাত অতীত ঘটনা যে একেবারেই মনে উঠিতে পারে না, এমন কথা বলিতেছি না। তবে সাধারণতঃ এরূপ ঘটনার যে-সকল বিবরণ পাওয়া যায়, সেগুলি বিচার-সহ নহে, ইহাই বলিতে চাই। কোন অতীত ঘটনা—যেমন আত্মীয়-বিয়োগ আদি—শুনিবার পর যদি আমার মনে হয় যে তাহা পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখিয়াছি, তবে তাহাতে অলৌকিকত্ব আরোপ করিবার কারণ নাই—স্মৃতি-বিভ্রমের ফলে এরূপ হওয়া সম্ভব।

স্বপ্নে ভাবী ঘটনার আভাস

স্বপ্নে আমাদের অনেক অতৃপ্ত ইচ্ছা চরিতার্থ হয়—একথা অনেকবার বলিয়াছি। মনে মনে আমার বিলাত যাইবার ইচ্ছা থাকিলে স্বপ্নে বিলাত **যাইতেছি** বা বিলাত **গিয়াছি**, এরূপ দেখা বিচিত্র নহে। যে ইচ্ছার ফলে বিলাত যাওয়ার স্বপ্ন দেখিলাম, সেই ইচ্ছাই হয় ত কালে আমাকে বিলাতে লইয়া যাইতে পারে। অতএব স্বপ্নে ভাবী ঘটনার আভাস থাকা আশ্চর্য্য নহে। সময়-সময় কোন-কোন ইচ্ছা মনে অজ্ঞাত থাকায় কেবল স্বপ্নেই আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপ ইচ্ছা কোন কারণবশতঃ পরবর্ত্তীকালে মনে উঠিয়া, আমাদিগকে তদনুরূপ কার্য্য করাইতে পারে। এরূপ স্থলেও স্বপ্নে ভবিষ্যৎ ঘটনা সূচিত হয়। এইজন্য আমরা বলি, যখন স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তখন ত জানিতাম না যে সেইমত কাজ করিতে হইবে। আমার এক রোগীর কথা বলি। সে স্বপ্ন দেখিল, তাহার হাতে বাত হইয়াছে। কিছুদিন পরে সত্যসত্যই তাহার হাতের কবজীতে বাত দেখা দিল। জাগ্রৎ অবস্থায় নানা কাজে

মন॰ ব্যাপৃত থাকে বলিয়া শরীরের অল্পবিস্তর অস্বাচ্ছন্দ্য আমরা অনুভব করিতে পারি না। নিদ্রাকালে এই অস্বচ্ছন্দতার কথা স্বপ্নে উদিত হওয়া সম্ভব। বাতের ব্যথা হয় ত পূর্ব্ব হইতেই অল্পস্বল্প ছিল, কাজের ঝঞ্ঝাটে দিনের বেলায় রোগী তাহা টের পায় নাই। রাত্রে সেই ব্যথার ফলেই বাতের স্বপ্ন দেখিয়াছে, আবার দিনের বেলা পুনরায় তাহার অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। বাত বৃদ্ধি হওয়াতেই পরে তাহার স্বপ্নের কথা মনে পড়িল। স্বপ্নের বাত বাস্তবে পরিণত হওয়ায় এরূপ স্বপ্ন তাহার কাছে আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল। বলা বাহুল্য এরূপ স্বপ্নেও কোন-না-কোন অজ্ঞাত ইচ্ছার আভাস থাকে। আর এক রোগী স্বপ্ন দেখিল, তাহার appendicitis হইয়াছে। পরদিন দেখা গেল, তাহার পেটে ব্যথা॰ হইয়াছে মাত্র। এস্থলেও বাস্তব ব্যথা স্বপ্নে appendicitis-রূপে দেখা দিয়াছে। জ্বরের স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গিবার পর সত্যসত্যই জ্বর অনুভব করা বিচিত্র নহে।

মনে করুন, আমার কোন আত্মীয় বিদেশে আছেন; সপ্তাহে সপ্তাহে তাঁহার চিঠি পাই। কিন্তু সব-সময়েই যে চিঠি নিয়মিতরূপে আসে, তাহা নহে। চিঠি

আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইলেই আমার মনে বিপদ-আপদের আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক। এই আত্মীয়ের মৃত্যু-কামনাও অজ্ঞাতসারে আমার মনে থাকিতে পারে। সুতরাং আমার পক্ষে তাঁহার কোন কঠিন ব্যাধি বা মৃত্যুর স্বপ্ন দেখা আশ্চর্য্য নহে। এই-সকল স্বপ্ন আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই, এবং পরে কুশল সংবাদ পাইলে এরূপ অমঙ্গল স্বপ্ন মনে পড়িবারও কোন কারণ থাকে না। কিন্তু বাস্তবিকই যদি অসুস্থতার জন্য আত্মীয়ের চিঠি দিতে বিলম্ব হইয়া থাকে, আর পরে যদি তাঁহার অসুখের খবর পাই, তবে দুঃস্বপ্নের কথা তখনই মনে পড়িয়া যাইবে, ভাবী ঘটনা স্বপ্নে দেখিয়াছি বলিয়া আশ্চর্য্যও হইব। স্বপ্নের ভবিষ্যৎ সূচনার প্রামাণ্য খুঁজিতে হইলে স্বপ্ন-বিবরণ লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য। স্বপ্ন লিখিয়া রাখিবার অভ্যাস করিলে পাঠক দেখিবেন, কত অশুভ স্বপ্ন মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। গণৎকারের গণনায় যে-যে বিষয় মিলিয়া যায়, সেইগুলিই আমাদের মনে থাকে, আর তাহাই আমরা লোকের কাছে গল্প করি। যাহা মেলে না, তাহার কথা একেবারেই ভুলিয়া যাই, ইহাই আমাদের স্বভাব। মনে করুন, কাহারও পুত্র হইবে, কি কন্যা হইবে, গণৎকার গণিয়া বলিয়া

দিল। গণনা ব্যর্থ হইলে গণৎকারের কথা আদৌ মনে উঠিল না; কিন্তু মিলিয়া গেলে গণৎকারের গণনার তারিফ করিলাম। এইরূপ মিল গণকের কৃতিত্বের প্রমাণ নহে। যদি আমি গণৎকার হইয়া সকল ক্ষেত্রেই বলি 'পুত্র হইবে', তবে দেখা যাইবে শতকরা প্রায় ৫০টি ক্ষেত্রে আমার কথা ঠিক। কারণ কন্যা-জন্মের সম্ভাবনা যত, পুত্র-জন্মেরও তত। কাজেই শতকরা ৫০এর বেশী ক্ষেত্রে আমার গণনার মিল দেখাইতে না পারিলে গণনা-শক্তি মানা চলে না। গণনা বা স্বপ্নদৃষ্ট কোন বিষয়ের সহিত বাস্তব ঘটনার মিল হইলেই তাহাকে অদ্ভুত আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। প্রবাসী আত্মীয়স্বজনের বিপদ-আপদের স্বপ্ন আমরা প্রায়ই দেখি; আর কোনস্থলে দৈবাৎ যদি তাহা ফলিয়া যায়, তবে সেরূপ স্বপ্ন যে ভবিষ্যৎ-নির্দ্দেশক তাহা বলা চলে না। এরূপ স্থলে Law of Probability বা সম্ভাব্যগণিতের সূত্র অনুসারে প্রামাণ্য স্থির করিতে হইবে। উদাহরণ দিয়া কথাটা বুঝাইতেছি। অনেকেরই ধারণা, তিথি-হিসাবে বাত কমে ও বাড়ে। মনে রাখিতে হইবে, বাত অন্য কারণে বা আপনা হইতেও কমিতে বাড়িতে পারে। অতএব তাহা তিথির প্রভাবে

বাড়িল, কি আপনা হইতেই বাড়িল, তাহা বলা সুকঠিন। অমাবস্যার পূর্ব্বদিন কি পরের দিন রোগ বাড়িলেও আমরা তাহার মূলে অমাবস্যা তিথির প্রভাব স্বীকার করিয়া লই ; আর অমাবস্যার দিন বাড়িলে ত কথাই নাই। সেইরূপ, পূর্ণিমার বেলা তিনদিন তিথির প্রভাব মানি। তাহা হইলে দেখা গেল, মোটের উপর পনের দিনের মধ্যে ছয় দিনের যে-কোন দিন রোগ বৃদ্ধি পাইলেই তিথির প্রভাবকেই আমরা তাহার কারণ-স্বরূপ ধরি। যে রোগ আপনি কমে বাড়ে, তাহারও পক্ষে ঐ ছয় দিনে কমা-বাড়া সম্ভব। অতএব তিথির প্রভাব প্রতিপন্ন করিতে হইলে দেখানো চাই যে, প্রতি পনেরটা অমাবস্যা পূর্ণিমা বা একাদশীর মধ্যে অন্ততঃ ছয়টার অধিক ক্ষেত্রে রোগ বাড়িয়াছে ; ইহার কম হইলে তিথির প্রভাব প্রমাণিত হইবে না। সুতরাং যে-সকল স্বপ্ন আমরা প্রায়ই দেখি, তাহা যে সময়ে-সময়ে ভাবী ঘটনা সূচিত করে, এরূপ মত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে রীতিমত হিসাব রাখা প্রয়োজন। অতীত ঘটনার ন্যায়, স্বপ্নে অজ্ঞাত বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত থাকাও একেবারে অসম্ভব নহে।

স্বপ্নে মৃতব্যক্তির আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার

মৃতব্যক্তির আত্মা আছে কিনা ও তাহা দেখা সম্ভব কিনা, তাহা আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। তবে স্বপ্নে এমন-কোন ঘটনা আমরা দেখি কিনা, যাহা ব্যাখ্যা করিতে হইলে মৃতব্যক্তির আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়—এখানে সেই কথাই আলোচনা করিব। এরূপ ঘটনা যে একেবারে ঘটিতে পারে না, তাহা বলা যায় না। তবে এরূপ ঘটনা পূর্ব্বে যে কখনও ঘটিয়াছে, তাহারও কোন সন্তোষজনক প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ফ্রয়েডের *Interpretation of Dreams* পুস্তকে একটি শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ আছে। এক ব্যক্তির সন্তান মারা যায়। প্রচলিত রীতি অনুসারে মৃত-সন্তানের চারিদিকে বাতি জ্বালাইয়া রাখা হয়; রাত্রে মৃতদেহ পাহারা দিবার জন্য একজন লোক নিযুক্ত থাকে। পিতা পাশের ঘরে নিদ্রিত; দুই ঘরের মাঝের দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত। পিতা স্বপ্নে দেখিলেন, মৃতপুত্র তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া

বলিতেছে, 'বাবা, দেখিতেছ না, আমি পুড়িয়া যাইতেছি।' পিতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ; তিনি ছুটিয়া পাশের ঘরে গিয়া দেখেন, যে-লোক পাহারায় ছিল, সে গভীর নিদ্রিত। একটা জ্বলন্ত বাতি উল্‌টাইয়া পড়ায় শবাস্তরণে আগুন লাগিয়াছে, আর তাহার ফলে মৃত বালকের একটা হাত পুড়িয়া গিয়াছে।

অনেকে হয় ত বলিবেন, মৃত বালকের আত্মা আসিয়া পিতাকে সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু এরূপ স্বপ্নেও বাস্তবিকপক্ষে যে মৃতব্যক্তিরই আত্মা আসিয়াছিল, তাহা প্রমাণিত হয় না। কারণ পাশের ঘরে শবাস্তরণে আগুন লাগায় সেই আলোক নিদ্রিত পিতার চক্ষে পড়িয়া আগুন-লাগার স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকিতে পারে। শোকার্ত্ত পিতার পক্ষে মৃত-সন্তানকে পুনর্জ্জীবিত দেখিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। সেইরূপ ইচ্ছার ফলে স্বপ্নে বালকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। হয় ত দায়িত্বহীন ব্যক্তি পাহারায় থাকায়, পিতার মনে এইরূপ দুর্নিমিত্ত কল্পনা পূর্ব্ব হইতেই স্থান পাইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত মৃতব্যক্তির আত্মার দর্শন-সংক্রান্ত যতগুলি স্বপ্ন বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহার কোনটিতেই মৃতব্যক্তির আত্মার আবির্ভাব স্বীকারের প্রয়োজন হয় নাই।

স্বপ্নে প্রত্যাদেশ

প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, স্বপ্নে অমুকের অমুক কাজ করিবার প্রত্যাদেশ হইয়াছে। এই প্রত্যাদেশ সাধারণতঃ কোন দেবতা বা কোন মৃতব্যক্তির আত্মার নিকট হইতে আসিয়া থাকে। কখন-বা কেবল 'অমুক কাজ কর'—এইরূপ আদেশ পাওয়া যায়; কে আদেশ করিতেছে, স্বপ্নে তাহার কোনও ইঙ্গিত থাকে না। দেবতা বা মৃতব্যক্তির আত্মার পক্ষে স্বপ্নে কোন আদেশ করা সম্ভবপর কিনা তাহার আলোচনা করিব না। দেবতার আবির্ভাব না মানিয়াও প্রত্যাদেশের স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে কিনা, দেখা যাক। আমি এমন কোন প্রত্যাদেশের স্বপ্নের কথা জানি না, যাহাতে দেবতার আবির্ভাব অবিসংবাদীরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কেহ কেহ হয় ত জীবনে মাত্র একবার প্রত্যাদেশের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। কেহ-বা আবার প্রায়ই দেখিয়া থাকেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর স্বপ্ন-দ্রষ্টার সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত অধিক। আমরা কেবল যে স্বপ্নেই দেবতার প্রত্যাদেশ পাই, তাহা নহে। আমি এমন

লোকও জানি যিনি জাগ্রৎ অবস্থাতেও নানারূপ প্রত্যাদেশ পাইয়া থাকেন। কেহ কেহ ঠিক প্রত্যাদেশ না পাইলেও বলিয়া থাকেন যে, কে যেন তাঁহাদের কানে কানে প্রায়ই কথা বলিয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক ভদ্রসন্তান চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসেন। বাড়ী-বাড়ী সৌখীন কাপড়-চোপড় ফিরি করিয়া বেচাই তাঁহার পেশা। তিনি আমাকে জানাইলেন যে, ব্যবসা চালানো তাঁহার দায় হইয়া উঠিয়াছে। যখনই তিনি খরিদ্দারকে কাপড়ের দাম বলিতে যান, তখনই শুনিতে পান, কে যেন কাপড়ের কেনা দাম বলিয়া দিতেছে, কাজেই ব্যবসায়ে লাভ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

লোকটি বুদ্ধিমান। ব্যাপারটা যে কাল্পনিক তাহা তিনি নিজেও বোঝেন; কিন্তু যখন এরূপ হয়, তখন বাস্তব ঘটনা বলিয়াই তাঁহার মনে হয়। এই ব্যক্তির কানে কানে কথা-শোনা এবং জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় প্রত্যাদেশ-শোনার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। উক্ত রোগীকে অনেক প্রশ্নের পর জানা গেল, তিনি 'কোকেন-খোর'। দীর্ঘকাল চিকিৎসার পর, তাঁহার এই কু-অভ্যাস দূর হইয়াছিল, রোগের হাত হইতেও তিনি

অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ প্রত্যাদেশ শুনিবার মূলে যে কোকেন বা গাঁজার নেশা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, তাহা নহে। এক ধরণের পাগল আছে, যাহারা কি জাগরণে, কি স্বপ্নে প্রায়ই এইরূপ 'কানে কানে কথা' বা প্রত্যাদেশ শুনিয়া থাকে। এই শ্রেণীর পাগলের সংখ্যা নিত্যান্ত অল্প নহে। একবার এক পাগল আসিয়া আমাকে জানাইল, মা কালী তাহাকে দুনিয়ার পাপীদের খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে অবিরত উত্তেজিত করিতেছেন। কিন্তু কে পাপী, আর কে পুণ্যাত্মা, এই লইয়া সে বিষম গোলে পড়িয়াছে। আমি আর এক পাগলকে জানি, তাহার অন্য কোন পাগলামি না থাকিলেও সে সর্ব্বদা শুনিতে পাইত, কে যেন তাহাকে অশ্লীল কথা বলিবার জন্য অবিরত পীড়াপীড়ি করিতেছে। সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থা ও পাগলামির মধ্যে কোন-একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা-রেখা টানা যায় না। এজন্য কোন ব্যক্তির অন্য-সব আচরণ স্বাভাবিক বোধ হইলেও কোন-একটা বিষয়ে তাহার মনোবিকার থাকিতে পারে; আর সেই কারণে তাহার পক্ষে নানা অমূলক ভ্রান্তি, অধ্যাস বা বিভ্রম (hallucination, illusion বা delusion) হওয়া

বিচিত্র নয়। জনসাধারণ এই-সব লোককে রোগগ্রস্ত বলিয়া মনে করে না।

মনোবিকার প্রায়ই বংশগত। এজন্য সন্ধান করিলে অনেক সময় পাগলের আত্মীয়স্বজন বা পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে নানারূপ মানসিক ব্যাধির পরিচয় পাওয়া যায়। স্বপ্নাদিষ্ট ব্যক্তির বংশ-পরিচয় আলোচনা করিয়া যদি কোন মানসিক ব্যাধির সন্ধান পাওয়া যায়, তবে স্বপ্ন-দ্রষ্টার পক্ষেও যে মানসিক বিকারগ্রস্ত হওয়া সম্ভব, এ কথা ভুলিলে চলিবে না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যাদেশ দেবতা-মুখনিঃসৃত না হইতে পারে। অনেক অবরুদ্ধ ইচ্ছা কার্য্যকরী হইবার জন্য মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে; আর এরূপ ইচ্ছা প্রত্যাদেশ-রূপেও স্বপ্নে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। পাঠক হয় ত আপত্তি তুলিবেন, অসামাজিক ইচ্ছাগুলিই ত কেবল অবরুদ্ধ থাকে; কিন্তু আমরা যে-সব প্রত্যাদেশ পাই, তাহা যে পুণ্যকর্ম্ম-মূলক। এখানে মনে রাখিতে হইবে, প্রত্যাদেশে যে কেবল সৎকর্ম্মেরই ইঙ্গিত থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। উপরে এক রোগীর কথা বলিয়াছি, সে কেবল অশ্লীল কথা বলিবারই প্রত্যাদেশ পাইত। অনুকর্ষী বায়ু (Compulsion psycho-neurosis)

নামে এক রকম মানসিক ব্যাধি আছে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে রোগীর মনে কোন-একটা বিশেষ কাজ করিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা জাগিয়া উঠে। এইরূপ ইচ্ছা দমন করিবার জন্য রোগী অনেক চেষ্টা করে সত্য, কিন্তু সকল সময়ে কৃতকার্য্য হয় না। হয় ত মনে উঠিল, রাস্তা চলিবার সময় প্রত্যেক গ্যাস-পোষ্ট ছুঁইয়া চলিতে হইবে। কাহারও-বা খেয়াল হইল, ১০৮ না গুণিয়া পথে বাহির হইলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। রোগীর কোথাও যাইবার তাগিদ থাকিলেও ১০৮ না গণা পর্য্যন্ত তাহার বাহির হইবার যো নাই। হাজার চেষ্টা করিয়াও এইরূপ কার্য্য হইতে রোগীরা নিজেকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না। যে-সব ক্ষেত্রে কার্য্যগত ইচ্ছাটি অসামাজিক, সেইখানেই এরূপ চেষ্টা অধিক। যে রোগীর মনে ক্রমাগত অশ্লীল কথা উঠিবার চেষ্টা করে, তাহাকে দিবানিশি ঠাকুর-দেবতার নাম স্মরণ করিয়া সেই অশ্লীল ভাব চাপা দিতে হয়। এই ধরণের রোগীর পক্ষে স্বপ্নে হরিনাম-সংকীর্ত্তনের প্রত্যাদেশ পাওয়া বিচিত্র নহে। কখন কখন আবার আমাদের অনেক অবৈধ ও উৎকট ইচ্ছা ধর্ম্মানুষ্ঠানের আবরণে চরিতার্থতলাভ করে। অনেক মনোবিদের মতে,

ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূলে বীভৎস ইচ্ছা বর্ত্তমান। ভারতের অনেক পুণ্যতীর্থে মন্দির-গাত্রে অশ্লীল মূর্ত্তিসমূহ খোদিত আছে। শাস্ত্রকারেরাও মন্দির-গাত্রে অশ্লীল মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এরূপ করিবার উদ্দেশ্য বা সার্থকতা সম্বন্ধে কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। নানারূপ অসৎ প্রবৃত্তির অবদমন (repression) হইতেই যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের উৎপত্তি, এ কথা মানিয়া লইলে মন্দির-গাত্রে কেন যে অশ্লীল মূর্ত্তি থাকে, তাহা বোঝা সহজ হইয়া পড়ে। শত্রু-বিজয়ের স্মৃতিস্তম্ভে যেমন শত্রু ও বিজেতা উভয়েরই মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়, সেইরূপ ধর্ম্মের মূলগত অসৎ প্রবৃত্তির প্রতীক এবং দেবতা—উভয়ই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেবতার—যেমন মহাদেবের—মূর্ত্তিই লিঙ্গমূর্ত্তি।

পাঠক দেখিলেন, মনের মধ্যে অসৎ প্রবৃত্তি থাকিলে তাহার ফলে কেবল যে অসৎ কার্য্যেরই প্রত্যাদেশ হয়, তাহা নহে—ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রত্যাদেশ পাওয়াও সম্ভব। অসৎকার্য্যমূলক প্রত্যাদেশের কথা সচরাচর আমাদের কানে আসে না। তাই জনসাধারণের ধারণা, প্রত্যাদেশ বুঝি কেবলই সৎকার্য্যমূলক হয়।

স্বপ্নে দ্রব্যলাভ

কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা অনেক সময় স্বপ্নঘোরে দ্রব্যাদি পাইয়াছেন। স্বপ্নে দেখা গেল, 'অমুক স্থানে অমুক জিনিষ আছে।' ঘুম ভাঙ্গিবার পর স্বপ্নদ্রষ্টা সত্যসত্যই সেখানে গিয়া স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু দেখিতে পাইলেন। রোগী দেবতার স্থানে 'হত্যা' দিল; স্বপ্ন দেখিল, দেবতা তাহার হাতে ঔষধ দিলেন। নিদ্রাভঙ্গে রোগী দেখিল, তাহার হাতের মুঠায় শিকড় রহিয়াছে। স্বপ্নাদ্য মাদুলীতে অনেকেই আস্থাবান। যাঁহারা বিনামূল্যে বা মূল্যের বিনিময়ে স্বপ্নাদ্য মাদুলী বিতরণ করেন, তাঁহাদের মাদুলীগুলি সবই যে স্বপ্নে পাওয়া, তাহা নহে। মাদুলীর মধ্যস্থিত ঔষধাদির নাম স্বপ্নে পাইয়া পরে 'স্বপ্নাদ্য মাদুলী' প্রস্তুত হয়। স্বপ্নে ঔষধের নাম পাওয়া কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে। সুতরাং 'স্বপ্নাদ্য মাদুলী' সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক। স্বপ্নাদ্য মাদুলীতে রোগ সারে, এ কথা আমিও মানি। অনেক পেটেণ্ট ঔষধের ব্যবসাদার হয় ত স্বীকার করিবেন, কেবল জলে অল্প নূন দিয়া তাহা 'সর্ব্বব্যাধিহর অব্যর্থ ঔষধ'-রূপে প্রচার

করিয়া তাঁহারা প্রচুর অর্থোপার্জ্জন ত করিয়াছেনই, পরন্তু বহু গণ্যমান্য লোকের নিকট হইতে রোগ-আরোগ্যের ভাল ভাল প্রশংসাপত্রও পাইয়াছেন। সাধারণের ধারণা, দৈবের ফলে রোগের উৎপত্তি—ঔষধ সেবনে তাহা সারে। কাজেই রোগ আপনা হইতে সারিয়া গেলেও ঔষধের সুখ্যাতি। কোন ঔষধে যথেষ্ট আস্থা থাকিলে শুধু বিশ্বাসের জোরেই রোগের উপশম হওয়া সম্ভব—এ কথা সকলেই জানেন। কাজেই রোগ সারিবার মূলে যে স্বপ্নাদ্য ঔষধের কার্য্যকারিতা মানিতে হইবে, এমন-কোন কথা নাই। অনুসন্ধান করিলে পাঠক জানিতে পারিবেন, অনেক ক্ষেত্রেই স্বপ্নাদ্য ঔষধে কোনও ফল পাওয়া যায় নাই। গল্প করিবার সময় আমরা এই-সকল ঘটনা ভুলিয়া যাই। আমি এমন ঘটনাও জানি, ৺তারকনাথের ঔষধ পাইয়া, যথারীতি নিয়ম পালন করা সত্ত্বেও কোনও ফলোদয় হয় নাই। স্বপ্নাদ্য ঔষধ-সেবনে আরোগ্যলাভ বিশেষ আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার না হইলেও, বাস্তবিকই যদি স্বপ্নে ঔষধ হস্তগত হইতে দেখা যায়, তবে তাহাকে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলিয়া মানিতে হইবে। পাঠক মনে রাখিবেন, দেবতা লইয়াও ব্যবসা চলে। দেবস্থানের

মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেক সময় মোহন্ত বা দেবতার অধিকারী ছলকলার আশ্রয় গ্রহণ করেন। চিন্তাপীড়িত উপবাসক্লিষ্ট শ্রান্তক্লান্ত নিদ্রিত রোগীর হস্তে ঔষধ গুঁজিয়া দিয়া কৃত্রিম স্বপ্নাদেশ দেখানো একেবারে অসম্ভব নহে। অত্যন্ত নিদ্রাতুর ক্লান্ত ব্যক্তির কর্ণে কোন কথা বলিয়া তাহার হস্তে ঔষধ গুঁজিয়া দিলে নিদ্রাভঙ্গে তাহার মনে হইবে, স্বপ্নে সে প্রত্যাদেশ শুনিয়াছে। বিশেষতঃ লোকটি যদি প্রত্যাদেশ আশা করিয়া থাকে, তবে এরূপ ভ্রমের সম্ভাবনাই অধিক। জাগ্রৎ অবস্থায় হস্তে ঔষধ দেখিলে তাহার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইবে। নিদ্রাকালে যে আমরা অন্যের কথা শুনিতে পারি, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। পাঠক মনে রাখিবেন, সকল ক্ষেত্রেই যে এইরূপ ঔষধ পাওয়ার মূলে চাতুরী বিদ্যমান, আমি এমন কথা বলিতেছি না।

চাতুরীর কথা ছাড়িয়া দিলেও স্বপ্নে কোন দ্রব্য বা তাহার সন্ধান পাওয়া যে সম্ভব, এবার তাহাই বলিব।

আমি এক হিষ্টিরিয়া রোগিনীর চিকিৎসার জন্য আহূত হই। স্ত্রীলোকটি প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া রোগ

ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার প্রায়ই ফিট হইত ; আর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেন। একটি মাদুলী ধারণ করায় তাঁহার রোগ সারিয়া যায়। তিনি প্রায় তিন বৎসরকাল ভালই ছিলেন। হঠাৎ মাদুলীটি হারাইয়া যায় ; সঙ্গে-সঙ্গে রোগও পুনরায় দেখা দেয়। এইভাবে কিছুদিন ভুগিবার পর আমার উপর চিকিৎসার ভার পড়ে। কিছুদিন চিকিৎসার পর রোগিনী স্বপ্ন দেখিলেন, ভাঁড়ার-ঘরে একটি পুরানো হাঁড়ির মধ্যে তাঁহার হারানো মাদুলী পড়িয়া আছে। পরদিন সকাল-বেলা সেই হাঁড়ি হইতে সত্যসত্যই মাদুলীটি পাওয়া গেল, আর তাহা ধারণ করায় রোগ পুনরায় সারিল। আমি রোগিনীর স্বামীকে বলিলাম, রোগ সারে নাই—কিছুদিনের জন্য চাপা আছে মাত্র। অতএব চিকিৎসা চালানো আবশ্যক। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিছুদিন পরে পুনরায় ফিটের আক্রমণের পূর্ব্ব-লক্ষণ দেখিতে পাইলাম। আমি রোগিনীর স্বামীকে বলিলাম, পুনরায় মাদুলী হারাইবার সম্ভাবনা আছে ; কারণ মাদুলীতে বিশ্বাসের ফলে মাদুলী-ধারণের অবস্থায় ফিট হইবে না, অথচ বোঝা যাইতেছে ফিট হইবেই। অগত্যা মাদুলীতে বিশ্বাস

বজায় রাখিতে হইলে মাদুলী হারানো ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমার কথা ফলিল। কিছুদিন পরে আবার মাদুলী হারাইল—সঙ্গে সঙ্গে রোগও দেখা দিল। রোগিনী যে ইচ্ছা করিয়া মাদুলী হারাইয়াছে, তাহা নয়; তাঁহাকে এক অজ্ঞাত ইচ্ছাই অসাবধান করিয়া মাদুলী হারাইবার সুযোগ দিয়াছে। এরূপস্থলে হারানো মাদুলী কোথায় আছে, রোগিনীর অজ্ঞাত মন তাহা জানে। আমি বিশেষ উপায়-অবলম্বনে রোগিনীর স্মৃতি উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম; তাঁহাকে বলিলাম, হারানো মাদুলী কোথায় আছে, পুনরায় স্বপ্নে জানিতে পারিবেন। ফলে তাহাই হইল। মাদুলী আবার পাওয়া গেল। স্বপ্নে নষ্ট দ্রব্যের উদ্ধার বা নূতন দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব নহে। কেহ অন্যমনস্কভাবে দেখিলেন একস্থানে কোন দেবমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। ঘটনাটি তাঁহার মন হইতে লোপ পাইল। কিছুদিন পরে স্বপ্ন দেখিয়া সেই দেবমূর্ত্তির উদ্ধার সম্ভব। নিদ্রার ঘোরে চলিয়া বেড়ানো বা কাজকর্ম্ম করা বিচিত্র নয়। ইহাকে 'নিশিতে' পাওয়া বা স্বপ্ন-বিচরণ (somnambulism) বলে। নিদ্রার ঘোরে যাহা কিছু করা যায়, ঘুম ভাঙ্গিবার পর তাহার কিছুই

মনে না পড়িতে পারে। কোন দ্রব্য নিদ্রাবস্থায় আনিয়া বা কোথাও রাখিয়া, সেইদিন বা অপর কোন দিন তাহা স্বপ্নে দেখা অসম্ভব নহে। স্বপ্নে ঔষধ পাওয়ার মূলে অনেকস্থলে এইরূপ স্বপ্ন-বিচরণও সম্ভব।

স্বপ্নে অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি, কিন্তু এ-সম্বন্ধে সঠিক তথ্য নির্ণয় করা বহু অনুসন্ধান-সাপেক্ষ, আর তাহা একজনের চেষ্টায় হইবার নয়। মোটের উপর বলিতে পারি, স্বপ্নে অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের অস্তিত্ব একেবারে অসম্ভব না হইলেও আজ পর্য্যন্ত তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় নাই।

ইতর প্রাণীর স্বপ্ন

মানুষ ভিন্ন অপর প্রাণী স্বপ্ন দেখে কিনা, সে-সম্বন্ধে মনোবিদগণ একমত নহেন। অধিকাংশ মনোবিদের মতে, ইতর প্রাণী প্রত্যক্ষের অনুভূতি দ্বারা চালিত হয়; ভোজ্যদ্রব্য দেখিয়া খাইতে ছুটে, শত্রুর সাক্ষাৎ পাইয়া বা পদশব্দ শুনিয়া পলায়ন করে। মানুষের কার্য্য অনেকস্থলে এই প্রকার হইলেও সে সাধারণতঃ চিন্তাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ক্ষুধার সময় আহার না পাইলে কি করিয়া তাহা মিলিবে, কোথায় যাইতে হইবে, এইরূপ চিন্তা মানুষের মনে উদিত হয়। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, দার্শন শ্রাবণ প্রভৃতি প্রতিরূপ (image) দ্বারা তাহার চিন্তা গঠিত। বস্তু বা ঘটনার অবর্ত্তমানে মনের মধ্যে তাহার প্রতিরূপ কল্পনা করিয়া চিন্তা করাই মানুষের বিশেষত্ব। মনোবিদেরা বলেন, ইতর প্রাণীর মনেও যে এই প্রকারের প্রতিরূপ উঠে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যে-বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট প্রমাণের অভাব, বৈজ্ঞানিক তাহার অস্তিত্ব মানিতে প্রস্তুত নহেন। ইতর প্রাণীর

মনে প্রতিরূপ না উঠিলে, তাহার স্বপ্ন দেখা অসম্ভব। এমন কি প্রতিরূপের অভাবে স্মৃতি পর্য্যন্ত থাকিতে পারে না। যখনই কোন বিষয়ের স্মৃতি আমাদের মনে জাগে, তখনই সেই বিষয়ের প্রতিরূপ মনে উদিত হয়। আপত্তি উঠিবে, ইতর প্রাণীর মনে প্রতিরূপের অভাবে যদি স্মৃতির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয়, তবে কেমন করিয়া দীর্ঘ অদর্শনের পর কুকুর তাহার মনিবকে চিনিতে পারে; কি করিয়াই বা মনিবের বিরহে সে দুঃখ অনুভব করে। বৎস-হারা হইলে গাভী যে কষ্ট অনুভব করে, তাহা কি প্রকারে সম্ভব? মনোবিৎ বলিবেন, বহুদিন অদর্শনের পর হঠাৎ মনিবকে দেখিয়া কুকুর যে চিনিতে পারে, তাহা স্মৃতির সাহায্যে নহে। প্রত্যহ মনিবকে দেখিতে দেখিতে কুকুরের কতকগুলি অভ্যাস দাঁড়াইয়া যায়। মনিবের অদর্শনে অভ্যস্ত উদ্দীপকের (stimulus) অভাব অনুভব করিয়া তাহার কষ্ট হয়। মনিবের মূর্ত্তি তাহার মনে উঠিয়া কষ্ট হইতেছে, এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। বহুদিন পরে মনিবকে দেখিবামাত্র অভ্যস্ত উদ্দীপক পাইয়া তাহার মন আনন্দাপ্লুত হয়। মানুষ যে-ভাবে পরিচিত ব্যক্তিকে চিনিতে

পারে, ইহা সেরূপ নহে। প্রত্যহ পোলাও খাওয়া অভ্যাস হইলে, পোলাও না পাইলে কষ্ট হইতে পারে, এবং পুনরায় তাহা পাইলে মনে আনন্দ জাগিতে পারে—যদিও এরূপ কষ্ট বা আনন্দের সহিত সকল সময়ে পোলাও-এর প্রতিরূপ জড়িত থাকে না। বৎসের বিয়োগে গাভীর দারুণ শোকচিহ্ন প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু সেই অবস্থায় যদি তাহার সম্মুখে চামড়ার ভিতর খড়-দেওয়া একটা নকল বাছুর খাড়া করা যায়, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই তাহার শোকের উপশম হয়, নকল বাছুরকে আসল বৎস ভাবিয়া সে আনন্দে তাহার গা চাটিতে থাকে। যদি নকল বাছুরের গায়ের চামড়া ফাটিয়া কোথাও খড় বাহির হইয়া থাকে, তবে গাভী হৃষ্টমনে তাহাও খাইতে থাকে। এইরূপ ঘটনা হইতে মনোবিৎ অনুমান করেন, ইতর প্রাণীর মনে প্রতিরূপ উদিত হয় না। ইতর প্রাণীর যে বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও মানুষের বুদ্ধির অনুরূপ নয়। কারণ, ইতর প্রাণীর বুদ্ধিপ্রসূত কার্য্যেও কোন প্রতিরূপ-সংযুক্ত চিন্তার অস্তিত্ব আছে, এমন প্রমাণ নাই। সার্কাসের জীবজন্তু যে-সব বুদ্ধির খেলা দেখাইয়া থাকে, তাহাও প্রকৃত বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। অভ্যস্ত

কার্য্যের সামান্য পরিবর্ত্তনে তাহাদের বুদ্ধি খেলে না।

আমি কিন্তু ঠিক এই মত সমর্থন করি না। মানুষের চিন্তায় সকলক্ষেত্রে যে প্রতিরূপ উঠে, তাহাও ত বলা চলে না। অপরের মনের কোন খবরই আমরা প্রত্যক্ষ-ভাবে জানিতে পারি না। ব্যবহারে বা ভাষায় সে যাহা ব্যক্ত করে, তাহার দ্বারাই তাহার মনের ভাব অনুমান করিতে পারি। কাহাকেও উত্তেজিত অবস্থায় অপর এক ব্যক্তিকে মারিতে দেখিলে, সে যে রাগের বশেই এরূপ করিতেছে, একথা নিশ্চিতরূপে বলা চলে না। তাহার কথার উপরই নির্ভর করিয়া বলিতে হয়, তাহার রাগ হইয়াছে। এই কথা বা ভাষায় ভাব-প্রকাশ শেষ পর্য্যন্ত একটি বিশেষ আচরণমাত্র। ভাষার দ্বারা প্রকৃত মনের ভাব নিরূপণও অনুমান-সাপেক্ষ এবং ভাষা ব্যতীত অপর আচরণের দ্বারাও মনের ভাব অনুমান করা সম্ভব; কোনক্ষেত্রেই কিন্তু নিশ্চয়তার সহিত কিছু বলা চলে না। মানুষ পরিচিত বন্ধুকে দেখিয়া নমস্কার করিল, আর কুকুর পুরানো মনিবকে দেখিয়া লেজ নাড়িল। এই উভয় আচরণই অনুরূপ। মানুষের বেলায় স্মৃতি জাগিল,

আর কুকুরের বেলায় জাগিল না—একথা ঠিক না-ও হইতে পারে। কোন ব্যক্তি সন্তান-বিয়োগে শোকাভিভূত হইল। গুরু আসিয়া তাহাকে বালগোপালের সেবা করিতে দিলেন। বালগোপালের মূর্ত্তি পাইয়া তাহার পুত্রশোক প্রশমিত হইল। এই ঘটনা আর নকল বৎস পাইয়া গাভীর শোক-প্রশমন কি একই নয়? বালগোপালের মূর্ত্তির রং চটিয়া যাওয়ায় রং-মিস্ত্রি ডাকাইয়া তাহার সংস্কার করা, আর গাভীর নকল-বৎসের ভিতরকার খড় খাওয়া—একই ধরণের আচরণ। পশুর বেলায় এরূপ আচরণে যদি প্রতিরূপের অস্তিত্ব না মানি, তবে মানুষের বেলাই বা তাহা মানিব কেন? কুকুর সময়ে-সময়ে কাল্পনিক শত্রুকে তাড়া করে; কোন বিপদের কারণ প্রত্যক্ষ না করিয়াও ভয়ে আড়ষ্ট হয়। কে বলিবে, তাহার মনে প্রতিরূপ জাগে নাই? নিদ্রিত কুকুরকে লক্ষ্য করিলে, অনেক সময় এমন আচরণের পরিচয় পাওয়া যায় যাহাতে ধারণা হয়, তাহার মনে বিশেষ বিশেষ প্রতিরূপ জাগিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে ইতর প্রাণী স্বপ্ন দেখে না, এমন কথা বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। তাহার স্বপ্ন হয় ত মানুষের স্বপ্নের মত জটিল

না হইতে পারে। ক্ষুধাতুর কুকুর খাদ্যের স্বপ্ন দেখিতে পারে, ভয়ের স্বপ্ন হয় ত সে দেখে। কিন্তু এ-সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিতরূপে বলিবার উপায় নাই।

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

ইংরেজী শব্দের নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট